কৃষ্ণকলি

কৃষ্ণকলি



শ্রীতারাপদ রাহা



প্রাপ্তিস্থান
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রকাশিকা—শ্রীদীপ্তি রাহা
কথা ভবন
২৭।২।৩ কাঁকুলিয়া রোড, বালিগঞ্জ
কলিকাতা—১৯

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৬৩

মুদ্রাকর—শ্রীহেমন্তকুমার পোদ্দার
পোদ্দার প্রিন্টার্স
৪এ, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

কৃষ্ণকলি



মেয়েটির বর্ণ শ্যাম, কিন্তু ডাকনাম কালো। ভালো নাম নাকি কৃষ্ণা। আমি ওর নাম রেখেছি কৃষ্ণকলি। অবশ্য প্রকাশ্যে কোনদিন ডাকিনি ওকে এ নামে। এ নাম শুধু আমার মনে মনে রাখা নাম। পরের মেয়ের উপর কোন কারণে অপত্য-স্নেহ জাগলেও বাইরে তা পুরোপুরি প্রকাশ করতে বাধা আছে বইকি, বিশেষ করে বয়স যদি তার ষোল সতের হয়।

মেয়েটির উপর আমার প্রথম মায়া পড়ে তার কান্না শুনে,—বছর দুয়েক আগে। তখন সবে মাসখানেক হ'ল ওরা আমাদের পাশের বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে এসেছে। রাত্রি দশটার কাছাকাছি বাড়ি ঢুকতে গিয়েই শুনি পাশের বাড়ির ঐ ঘরটিতে কে একটি বড় মেয়েকে বেদম জোরে পেটাচ্ছে, আর মেয়েটি বেশ ডাক ছেড়েই কাঁদছে।

পাড়াতে অত বড় ধিঙ্গি মেয়েকে কখনও মারতে দেখিনি কাউকে, সুতরাং মার খেয়ে কাঁদতেও শুনিনি কাউকে। কিছুটা সহানুভূতি আর ক্রোধ নিয়ে ছুটে গেলাম থামাতে, কিন্তু পারলাম না। দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল ওরা। ঘনঘন কড়া নাড়লাম, দরজায় ঘুষিও কয়েকটা চালালাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না : দরজা খুললে না ওরা।

ফিরে এসে সুলতাকে কথাটা বলতেই সে বললে, ও বাড়িতে ত ও নিত্যিই লেগে আছে : প্রায় রোজই মার খায় ঐ মেয়েটি।

রোজই ?

রোজ না হলেও—প্রায়ই।

কে মারে ওকে অমনি করে ?

মারে ওর মা। আর শুধু মারে,—ঝাঁটা দিয়ে মারে।...আজ বোধ হয় ওর দাদা পেটাচ্ছে।

কেন ?

ওমা, তা আমি কি করে বলব !

পরের দিন সন্ধ্যায় চা খাবার সময় সুলতাই কিন্তু জানিয়ে দিলে আমায় মেয়েটির মার খাওয়ার কারণটা। কালো,—মানে পাশের বাড়ীর ঐ মেয়েটা কাল রাত্রে মার খাচ্ছিল কেন—জিজ্ঞাসা করেছিলে না ? খবর নিয়েছি আমি, কেন ও মার খাচ্ছিল ।

কেন, কি ব্যাপার কি !

ব্যাপার—মানে—কাল রাত্রে রান্না না করে আড়ি করে শুয়ে ছিল ও। ওর দাদা এসে দেখে খাওয়ার কোনই যোগাড় হয় নি—, তাই মার !

বাড়ীতে আর একজন বর্ষীয়সী বিধবা মেয়েছেলেও ত দেখি, বোধ হয় ওদের মা, তিনি রাঁধেন নি কেন ?

তিনি ত দিনরাত মঠ, আশ্রম আর মন্দিরে ধর্ম করেই বেড়াচ্ছেন, রাত সাড়ে ন'টায় ভাগবত পাঠ শুনে এসে দেখেন রান্না হয় নি। আর তিনিই ত বড় ছেলের কাছে নালিশ করে মার খাওয়ালেন। আর নিজেও ত তিনি দু'একদিন পরই ঝাঁটা ধরেন।

কিন্তু মেয়েটাই বা আড়ি করে রান্না বন্ধ করতে গেল কেন ?

সুলতা মুরুব্বিয়ানার স্বরে বললে, মেয়েটির মাথায় বোধ হয় একটু ছিট আছে,—তা ছাড়া ওর আড়ি করবার কারণও আছে বই কি। ওর দাদা কোন কোম্পানীর কাজে কোথায় কোথায় টুর করে বেড়ায়,—এবার ওর ছোট বোন শ্যামলীর জন্ত এনেছে অতি সুন্দর একখনো শাড়ি, আর ওর জন্ত নিতান্ত আটপৌরে রঙীন একখানা শাড়ি—যা পরে' শুধু রান্নাই করা চলে, বাইরে বেরুনো যায় না।

এ তারতম্যের কারণ কি ?

কারণ—শ্যামলী স্কুলে যায়, তার ভাল জামা কাপড়ের প্রয়োজন আছে, আর ওর বাইরে বেরুবার প্রয়োজন নেই, করতে হয় ওকে কেবল রান্না আর ঘরকন্না।

শুনে বেশ একটু কষ্ট লাগল মেয়েটির জন্ত। এতে ত লাগবারই

কথা ওর মনে। ওর ছোটবোনকেও ত দেখেছি আমি, ওর চেয়ে বছর দেড়েকের বেশি ছোট নয়। মেয়েটিকে একটু সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছা জাগছিল মনে।

দিন চারেক পরে বিকেলে বাড়ি ঢুকবার সময় দেখি মেয়েটি জানালা দিয়ে আমাদের বাড়ির উঠানের দিকে চেয়ে আছে। সেদিন স্থলতার মুখে সব কিছু শোনার পর কেমন যেন একটু মায়া পড়ে গিয়েছিল মেয়েটির উপর, ওর দিকে চেয়ে বললাম, কি দেখছ, খুকি, অমন করে?

ওমা,—আমি আবার খুকি না কি, এত বড় ধিঙ্গী মেয়ে—খুকী? আমার নাম ত কালো।

হাসতে হ'ল: খুকী বলতে আপত্তি থাকে ত তোমার নাম ধরেই ডাকা যাবে, কিন্তু তুমি কি দেখছ অমন করে বল ত।

সঙ্কোচের সলজ্জ হাসি হাসতে গিয়ে দাঁতগুলি প্রায় বেরিয়ে পড়ল কালোর,—বললে, আপনাদের ঐ গাছটায় কেমন পেয়ারা পেকে আছে দেখুন।

পাড়বে তুমি?—এসো।

মাসীমা কিছু বলবেন না?

না, দুটো পেয়ারা খাবে তুমি,—তা আবার...

কালো আর দ্বিরুক্তি না করে সলজ্জ হাসি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আমাদের বাড়িতে এই তার প্রথম পদার্পণ। একটা আঁকশী ছিল উঠানের এক কোণে দেওয়ালে ঠেস দেওয়া। তাই দিয়ে পেয়ারা পাড়তে যাচ্ছিলাম আমি, কালো বাধা দিয়ে বললে, আপনি চিনবেন না, আমি নিজে হাতে পাড়ব।—বলে হাসতে লাগল। আমিও হেসে আঁকশীটা তার হাতে তুলে দিলাম।

কালোর সঙ্গে আমাদের এই প্রথম ভাব। কালো অবশ্য কয়েকটা ভাল ভাল পেয়ারা আমাদের জন্যও রেখে গেল। যাবার সময় বলে গেল, মেসোমশাই, আমি যাচ্ছি—

এসো—

পেয়ারা পাকলে আবার আসব ত?

আবার হাসতে হ'ল : আসবে না।—নিশ্চয় আসবে, রোজ আসবে তুমি আমাদের বাড়ি,—পেয়ারা খাবে, আর গল্প করবে।

খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কালোর মুখ। বাঁ হাতে কোচড়ের পেয়ারা আগলে, ডান হাতে একটা পেয়ারায় কামড় দিতে দিতে সে আমাদের বাড়ি থেকে রওয়ানা হ'ল।

সুলতা বললে, মেয়েটির মাথায় একটু ছিট আছে। আমি বললাম, সেইজন্যই ত ওকে দেখে এত মায়া লাগে। আশেপাশে ওর বয়সী মেয়েদের মাঝে ও যেন একটা ব্যতিক্রম। বাগানে দেশী বিদেশী জমকালো ফুলের মাঝে ও যেন একটা কৃষ্ণকলি।

সুলতা আমার কথা শুনে বলে উঠল, বাব্‌বা—মেয়ে হয়নি তোমার তাই রক্ষে, হলে তুমি তাকে আস্কারা দিয়ে একেবারে মাথায় না তুলে ছাড়তে না।

হয়ত তাই, কিন্তু সুলতাও বোধ হয় আমার চেয়ে কিছু কম যেতেন না, কারণ, দেখলাম এর পর থেকে ঐ পরের মেয়ে কালোকে নিয়েই তিনি কম মাতামাতি সুরু করলেন না। গাছে ভাল পাকা পেয়ারা দেখলেই তিনি কালোকে আদরে আমন্ত্রণ করেন, ভাল কিছু রান্না হলেই তাকে ডেকে খাওয়ান। তুমি থেকে তুই ত দুদিনেই সুরু হয়ে গেল।

আর কালোও এদিকে নিজেও রান্নাবান্না কাজকর্ম সেরে ঐ যে আমাদের বাড়িতে এসে বসে, আর উঠতে চায় না। সুলতার সঙ্গে সঙ্গে সে ছায়ার মত ঘোরে। কখনও রান্নাঘরে, কখনও শোবার ঘরে বসে গল্প। আর সে গল্পের মাথামুণ্ড নেই,—রাজ্যের হাঁবি জাবি, ধানাই পানাই সব কথা—যা তার মনে আসে। সময় পেলে আমিও এদের আসরে যোগ দিই। বেশ লাগে এই মুখ-আলগা মেয়েটির কথা শুনতে। সহরের নানা কর্মজটিল জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে পাড়াগাঁয়ের আবহাওয়ায় যেন মনটা ক্ষণকালের জন্য হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

একদিন কালোকে বললাম, হাঁরে কালো, তুই এ পাড়ার আর কারো বাড়ি যাস না?

কালো ঠোঁট উল্টে চোখ ঘুরিয়ে বললে, কে যাবে, এ পাড়ার লোকদের যা গুমোর!

কিসের গুমোর রে ?

যার যা আছে, তার তাতেই গুমোর : কোন বাড়ির মেয়ের রঙ করসা, তার তাতেই গুমোর, কোন বাড়ির মেয়ে সেজেগুজে ইস্কুলে যায়, তার তাতেই গুমোর...

ইস্কুলে গেলেও গুমোর ?

নয় ত কি,—আমাদের সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে চায় না তারা!

স্কুলে ত তোদের বাড়ির মেয়ে—মানে তোর বোনও যায় ?

আপনি জানেন না, মেসোমশায়, ওর কি কম গুমোর নাকি,—সেই জন্যেই ত,—না থাক, সব কথা আর আপনার শুনে কাজ নেই...

নিজের বোনের সঙ্গে মনোমালিণ্যের কারণ শুনতে আর জিদ দেখালাম না, বুঝলাম নানা 'কমপ্লেক্সে' ভুগছে কালো। বললাম, তোরও ত এমন কিছু বয়স হয় নি, তুইও তোর বোনের মত ইস্কুলে যাস না কেন ?

ও কথা আর বলবেন না, মেসোমশায়, কে আমাকে যেতে দেবে ?—তাহ'লে যে হাঁড়ি শিকেয় চড়বে।

বুঝলাম, কালো স্কুলে যেতে পারে না বলে, তার মনে বেশ একটু দুঃখ রয়ে গেছে। একটু পরে কালো সুলতার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললে, জানেন মাসীমা, পাড়ার সবাই আমায় কি বলে ?

কি ?

সবাই বলে, আমি আপনাদের ধর্মমেয়ে।

শুনে সুলতা হাসলে। পরক্ষণেই কালো সুরু করলে, আচ্ছা মাসীমা, মাণিকদার বউ আনবেন আপনারা খুব লেখাপড়া-জানা মেয়ে বুঝি ?

কি জানি মা,—ভাগ্যে কেমন মেয়ে আসে,—তা কে জানে ?

যাই আনুন,—মূর্খই আনুন, আর পাশ করাই আনুন, দেমাকী মেয়ে আনবেন না, বাপু, ঘরে,—তাহ'লে আমার আসা বন্ধ হয়ে যাবে—তা আগে থাকতে জানিয়ে রাখছি, হাঁ—

শুনে আমরা দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

কালো মাতব্বরি চালে মাথা দুলিয়ে বললে, হাসির কথা নয় :

মাণিকদার বউ আসবে, তার সঙ্গে বসে গল্প করা আমার কতদিনের সাধ, আমার সে গুড়ে যেন বালি না পড়ে,—হাঁ…

মাণিক আমার একমাত্র পুত্রের নাম। বিয়ের বয়স তার হয়েছে,—সম্বন্ধও আসছে। কিন্তু তার স্ত্রীকে কেন্দ্র করে আমাদের মত কালোও যে স্বপ্ন দেখবে—এ কথা আর আমরা কোনদিন ভাবি নি।

মাস তিনেক পরে হঠাৎ একদিন মাণিকের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। মেয়ে সুন্দরী, ম্যাট্রিক পাশ, গান-বাজনাও একটু আধটু জানে।

মাঝে সময় বড় কম, তাতে একা মানুষ, একদিকে মন দিতে গেলে অন্যদিক কে দেখে তার ঠিক নেই। বড়ই বিব্রত হয়ে ছুটাছুটি করছিলাম। বাড়িতে এসেও সেই ছুটাছুটি আর যুক্তি পরামর্শ,—তার মাঝে কালোর অবিরত ঘ্যানর ঘ্যানর : মেসোমশায়, মাসীমা, বউদি গুমরে হবে না ত? কাজের বাড়িতে কাজের কথা শোনা বলারই ফুরসৎ থাকে না, তার মাঝে কালোর এ ঘ্যানঘ্যানানি শুনে মনে মনে বেশ খানিকটা বিরক্তিই বোধ হয়, তবুও মুখের ভাব যথাসাধ্য শান্ত রেখে বলি, তা আগে থেকে কি করে বলি বল!

কালো অমনি ঝাঁঝালো সুরে বলে ওঠে, কেন, তা আপনারা দেখে শুনে যাচাই করে নিতে পারলেন না,—কেবলি দেখলেন আপনারা পাশ আর রূপ,—বলে রাগে, বিরক্তিতে দেহটা এক অর্ধচক্রে ঘুরিয়ে চলে গেল। সুলতা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, দেখলে?

সত্যকার দেখা অবশ্য তখনও সুরু হয় নি, এ শুধু পূর্বাভাস। কালোর অনাছিষ্টি কাণ্ড সুরু হ'ল বিয়ের ঠিক আগের দিন থেকে। স্বীকার করছি ওদের নিমন্ত্রণপত্র দিতে একটু দেরীই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমি জানি সেটা অনাদর বা উপেক্ষায় নয়, বড় বেশি ঘনিষ্ঠ ভেবে। দূরের চিঠিপত্রই আগে বিলি করার ব্যবস্থা করেছিলাম, ভেবেছিলাম, এরা তো একেবারে ঘরের মানুষ, যখন তখন দিলেই হবে।

কাজের ঝামেলায় প্রথম দিকে তেমন নজরেই পড়ে নি যে কালো আসছে না। হঠাৎ শুনি ও ওর ছোট ভাই ঋণ্টুকে ধমকাচ্ছে, বুড়ো ধাড়ি ছেলে, লজ্জা করে না তোর ও বাড়ি যেতে?

ওদের ঘরের জানালা দিয়েই ওর মুখ দেখা যাচ্ছিল। তার দিকে চেয়ে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললাম, সে কি রে,—ওকে বকছিস কেন,—ওরা এসে হৈ চৈ না করলে বিয়ের কি মানে হয়, আর তুই ত দেখছি একেবারে 'নন-কো-অপারেশান' করেছিস আমাদের সঙ্গে। অন্য সময় দিনে চোদ্দবার আসতিস, আর এখন তোর একেবারে টিকির দেখা নেই।

কালো মুখ-ঝামটা দিয়ে বললে, কেন যাব আপনার বাড়িতে,—বিনা নিমন্ত্রণে কাকে যায় না,—আর এ ত মানুষ!

এমন কথা বলিস নে, কালো,—তোরা ত ঘরের লোক তাই চিঠি দিতে একটু দেরী হলেও দোষ হবে না মনে করেছিলাম।···এই ছাখ তোর দাদার নামে চিঠি লেখা রয়েছে, এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি চিঠি।

—কে চাইছে আপনার চিঠি? ওনাম কেটে পাঠিয়ে দেন গিয়ে আপনার কোন বড়লোক বন্ধুর নামে,—বলে এক অর্ধচক্র দিয়ে সে জানালা থেকে সরে গেল। এরপর অনেক মিষ্টিকথা, বিনয় আর যুক্তির অবতারণা করতে হয়েছিল ওদের ঐ নিমন্ত্রণের চিঠি গছাতে।

বিয়ের ব্যাপারে কালোকে আসতে দেখেছি, কিন্তু নানা হট্টগোলে ভাল করে নজর করতে ফুরসুৎ পাই নি, যেটুকু দেখেছি তাতে বুঝেছি—আমাদের সেই ধর্মমেয়ে কালো যেন আর সে নয়, এ মেয়ে শুধু নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছে। মনে মনে একটু হাসিও পেয়েছে আমার এ অযৌক্তিক বৃথা অভিমান দেখে। মনে হয়েছে—বাড়ির ব্যাপার চুকে গেলে দু'দিনে আবার তার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারব।

কিন্তু তা আর কই সম্ভব হ'ল। বাড়ীতে বৌ আসবার পরে কালো আর আমাদের বাড়িমুখো হতে চায় না। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কখনও কখনও আমাদের বাড়ির দিকে চেয়ে মুখ ভার করে কি যেন দেখে আর ভাবে, একটু পরেই সরে যায়। সুলতা আর আমি দু'জনেই পুত্রবধূ গৌরীকে শিখিয়ে দিয়েছি কালোকে ডাকতে। গৌরী মাঝে মাঝে ডাকেও: এস না, ভাই, আমাদের বাড়ি!

কালো প্রায়ই উত্তর দেয়, কাজ করছি এখন!

কই, এখন ত দাঁড়িয়ে আছ তুমি!

এইবার যেতে হবে কাজ করতে,—বলে কালো জানালার কাছ থেকে সরে যায়। কোন কোন ইতর জীব যেমন আগন্তুকের গন্ধেই বুঝে নেয় তার সঙ্গে ভাব করতে হবে, না বিরোধ, কালোও তেমনি কি এক সহজাত শক্তি বলে বুঝে নিয়েছে গৌরীকে, সে ভদ্রতা রক্ষা করতেও কাছে ঘেঁষতে চায় না তার।

পুত্রবধূ কাছে পেয়ে সুলতাও বুঝি ভুলতে বসেছে কালোকে। কালোর মুখ ভার দেখে আমার কিন্তু কেমন মায়া লাগে। ছেলের বিয়ের আগে স্বপ্ন দেখতাম—বউমা ঘরে এলে কালো আর তার হাস্যরবে আমার নীরব-প্রায় গৃহ মুখরিত হয়ে উঠবে, আনন্দের মেলা বসবে বাড়িতে। স্বপ্নভঙ্গে বিরক্ত হয়ে সুলতাকে ধমকাই : কালোকে ডাক না কেন বাড়িতে ?

কি করে কথাটা কানে যায় কালোর, সে ওদের ঘর থেকেই উত্তর দেয়, ডাকবেন কেন, এখন যে ফরসা বউ এসেছে ঘরে, এখন কি আর কালো কুচ্ছিৎ মেয়েকে নিয়ে গল্প করতে ভাল লাগে ?

ও বুঝি প্রায়ই কান পেতে থাকে আমাদের বাড়ির দিকে। সুলতা কালোর উত্তর শুনে বলে, শুনলে ত,—অমনি কামড় দেওয়া কথা দিন রাত লেগেই আছে ওর মুখে।

এই কামড়ের চরম হয়ে গেল—আরও কিছুদিন পর বেয়াই বাড়ি থেকে তত্ত্ব এলে। নূতন আত্মীয় বাড়ি থেকে তত্ত্ব এলে খাবার জিনিষ কিছু অবশ্য বিতরণ করবারই প্রথা। কিন্তু প্রতিবেশীর সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ এবং দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতিতে তত্ত্বের পরিমাণ এখন বাধ্য হয়ে এমন অসম্ভব রকম কম যে বাড়িতে বাড়িতে পাঠানো আর তা এখন সম্ভব হয় না। তবুও সুলতাকে বলে রেখেছিলাম, কালোদের বাড়ীতে গোপনে কিছু পাঠিয়ে দিও, আর না হয় কালোকে বাড়িতে ডেকে কিছু খাইয়ে দিও। সুলতাকে ওদের বাড়ির জন্য কিছু ফল আর মিষ্টি আলাদা করে রাখতেও দেখেছিলাম, কিন্তু কি কারণে না জানি তা আর তাদের বাড়ি পাঠানো হয় নি। সে খবরটা অবশ্য আমার জানা ছিল না।

তত্ত্ব আসার দিন চারেক পরে আপন মনে কি ভাবতে ভাবতে বাড়ি ঢুকছি—এমন সময় ওদের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে কালো ডাকলে, ও মেসোমশায়,—

তাকিয়ে দেখি তার মুখে শাণিত ছুরির ফলার মত কেমন এক বিদ্রূপের হাসি। পরক্ষণেই কালো আবার ডাকলে, ও মাসীমা,···ও মেসোমশাই, আপনাদের তত্ত্বের ফল মিষ্টি খাওয়া হয়ে গেল ? কেমন খেলেন,—খুব মিষ্টি,—না ?

আত্মাভিমানে আঘাত লাগল। অপরাধও হয়ত একটু ছিল,—কিন্তু তা ছাড়িয়ে উঠল আত্মমর্যাদা। কোন উত্তর না দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে এলাম। ঘরে ঢুকতে দেখি সুলতাও গম্ভীর মুখে কান খাড়া করে জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে।

কালো বলে চলেছে,—বাব্‌বা, এমন দেখি নি,···আগে ভাবতাম আপনারা মানুষ, আপনারা যে এত অমানুষ,—তা আর বুঝি নি,—বুঝলে কে আর আপনাদের ছায়া মাড়াত।····ভাববেন না আমরা লোভী, খাবার লোভে বলছি,—ফল মিষ্টি আমরা অনেক খেয়েছি,—আপনাদের ঐ পচা মিষ্টির প্রত্যাশী আমরা নই—

কানে এল শ্যামলী তাকে ধমক দিলে : দিদি তুই কি রে, থাম, লোকে বলবে কি, শুধু শুধু ঝগড়া করছিস কেন ?

ঝগড়া কিসের ? বলব না, হাজার বার বলব,—কাজের সময় কাজী কাজ ফুরুলে পাজী ? যখন বেটার বউ ছিল না, এটা ওটা করে দিতে ডাক পড়ত, তখন আমি ছিলাম ধম্মমেয়ে।····এখন যে বেটার বউ এসেছে, ফরসা, পাশ-করা, গাইয়ে বেটার বৌ,—সেই দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না এখন।

ঝড়ের মত এই কথাগুলি বলে সে যেন একটু দম নিয়ে নিলে, তারপর আবার সুরু করলে, ও মাসীমা,—বোবা হয়ে গেলেন নাকি,—উত্তর দিন, আপনারা কি ভদ্দর লোক,—না····

কালোর মা এসে কালোর মুখ চেপে ধরলে : ফের এসব কথা বলবি ত মুখ ছিঁড়ে দেব। সুলতা আমাদের ঘরের ওদের বাড়ির দিককার দরজাটা

সশব্দে বন্ধ করে দিলে।

কালোর এত কটূক্তি শুনেও কিন্তু আমি তার উপর রাগ করতে পারছিলাম না, কেমন এক অদ্ভুত অবিশ্লেষ্য বেদনা বোধ করছিলাম তার জন্য। এ বেদনার কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

জরুরী কাজে কয়েকদিনের জন্য বাইরে যেতে হয়েছিল। ফিরে এসে দেখি আমার ঠিকে মালী আমার ফুলবাগানের কৃষ্ণকলি গাছগুলি সব উপড়ে ফেলে সেখানে চন্দ্রমল্লিকার চারা এনে বসিয়েছে। বাগানের বাইরে ফেলা শুষ্ক ম্লান কৃষ্ণকলি গাছগুলির দিকে যেন চাইতে পারছিলাম না আমি। কালোর জন্যে মনটা কেমন করে উঠল। তাকে দেখব বলে তাদের ঘরের দিকে চোখ ফিরালাম। জানালা বন্ধ।

নিরাশ হয়ে বাড়ি ঢুকলাম। দেখি গৌরী প্রজাপতির মত সেজে শাশুড়ীর সামনে বসে হেসে হেসে গল্প করে চলেছে,—সুলতা আহ্লাদে ডগমগ।

—কালোর জন্যে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসছিল বুক থেকে, কোন রকমে চাপতে হ'ল তাকে।

মাটি আর মানুষ

কাল সকালে বাস্তু ছেড়ে যেতে হবে। বাড়ির আশপাশ থেকে যেন একটা চাপা কান্না শুনতে পান কমলা ঠাকরুণ। এ কান্না অবশ্য শুনছেন তিনি বহুদিন থেকে। ছেলে প্রাণতোষ স্ত্রীর চিঠিতে গ্রামের অবস্থার কথা শুনে যেদিন তার স্থির সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে সেদিন থেকেই তাঁর মনে হয় বাড়ির আশেপাশে কোথায় কে বা কান্না যেন কাঁদছে। গ্রামের অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা একে একে সবাই প্রায় উঠে গেল—নিজের চোখে দেখলেন কমলা ঠাকরুণ। তিনি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন এরূপ অবস্থায় ছেলের কাছে কোন অনুরোধ-উপরোধই তাঁর টিকবে না, তাই নাতি নাতনী বউকে আর তিনি আটকে রাখতে চা'ননি এখানে, শুধু একবার একরকম মিনতির সুরেই তিনি ছেলেকে লিখেছিলেন, বাবা, বউমা আর তোমার ছেলেমেয়েকে তোমার যেখানে খুশি নিয়ে যাও, আমার তিন কাল গেছে এক কাল আছে, আমাকে আর এখান থেকে টানাহেঁচড়া করো না,—মরতে হয় আমি এখানেই মরব।

পুত্র স্পষ্ট সরল নির্মম ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, তা হয় না, মা,—ওদের সঙ্গে তোমাকেও আসতে হবে,—পাগলামি করো না।....

তখন থেকে সেই চরম মুহূর্তের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে প্রতিদিন চেষ্টা করছেন কমলা। কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও মন কি তাঁর শুনতে চায়? এই হাতীর মত চা'র পোতায় চারখানি ঘর, এই গাছপালা, এই উঠান,—চিরকালের এই সব ছেড়ে যাওয়া কি সহজ কথা? এই উঠান মাঠের ধানের গন্ধে আর ভরে উঠবে না—একথা ভাবতেও তার চোখে জল এসে যায়। আর শুধু কি নিজের বাড়ি—এই গ্রামের প্রতিটি জিনিসের উপর তাঁর মায়া,—এই পথ ঘাট, এই নদী, দূরের ঐ অশথের শাখা, ঐ বাঁশবন—কোন্‌টি তাঁর ফেলবার। ছেড়ে যাবার আয়োজন চলেছে দেখে গ্রামের প্রতি ধূলিকণার জন্য যেন তাঁর প্রাণ কাঁদে।

রাত্রে চোখে ঘুম আসে না। গভীর রাত্রে মনে হয় কারা যেন

কাঁদছে। ভোর হলে তাঁর এই অনুভূতির কথা যাকে পান তার কাছে বলতে চান। প্রথম একদিন বলতে গিয়েছিলেন নিজেরই পুত্রবধূ আর নাতি নাতনীর কাছে।

পুত্রবধূ শিবানী শুনে বললে, ও আপনার মনের বিকার, মা,—না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাথা গরম হয়ে গেছে আপনার,...তা ছাড়া বাতাসের শব্দও হতে পারে।

শ্যামল আর রেখা কমলার কথা শুনে এক সঙ্গেই হেসে উঠল: ঠাকুমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

সেই অবধি তাদের কাছে আর কোন কিছু বলতে যান না কমলা। একমাত্র দরদী শ্রোতা হচ্ছে তাঁর পাশের বাড়ির কামারদের মালতী। মালতী ঐ বাড়িরই মেয়ে, বিধবা হয়ে যৌবনেই বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছিল। মেয়ের নাম ছিল তার রাঙী, তাই অনেকে তাকে রাঙীর মা বলেও ডাকে।

গ্রামের অনেক গৃহস্থই চলে গেছে, গ্রাম যেন খাঁ খাঁ করে, মালতীরও কিছুই ভাল লাগে না, তাই সময় পেলেই সে কমলার কাছে এসে নিজের সুখদুঃখের কথা বলে।

মালতীর কাছ থেকে কোন প্রতিকূল মন্তব্য শুনতে হয় না বলে কমলাও প্রাণ খুলে তার সঙ্গে কথা বলে নিজের মনের গুরুভার একটু লাঘব করে নিতে চেষ্টা করেন। নিজের বাড়ির লোকের কাছে উৎসাহ না পেয়ে মালতীর কাছেই কমলা শেষে নিজের মনের কথা বলতে সুরু করেন।

শুনে মালতী গভীর সহানুভূতির সুরে বলে,—স্থাহ দিন,—হবি নে? ওঁরা সব স্বর্গের থে' সব বুঝতি পারেন যে।—ওঁরা সব কম ভালবাসতেন —এ বাড়ি?

দুই চোখে জল ভরে আসে কমলার। আঁচলের খুঁটে জল মুছে নিয়ে কমলা উত্তর দেন,—আমার কি মনে হয়, বোন, জানো?—আমার মনে হয় এ বাস্তুর কান্না,—বাস্তু ত মাটি নয়—মা ভগবতী; আমার শাশুড়ী বলতেন বাস্তু মাটি নয়, মা—টি, আদর করে সবাই যেমন বলে, আমার ভাই-টি, বোন-টি, তেমনি বাস্তু আমাদের মা-টি।

মালতী সকল কথা গম্ভীর হয়ে শুনে বলে, তা হ'তি পারে।

মালতী সকল কথা বুঝুক না বুঝুক প্রতিবাদ করে না,—তাই তার কাছে মনের কথা বলে কমলা একটু স্বস্তি পান। বাড়ির সবাই—ছেলে থেকে আরম্ভ করে নাতি নাতনী পর্যন্ত—সবাই নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা কমলার চেয়ে বেশি বলে মনে করে, তাই বুড়ীর দুঃখকে তারা পাত্তাই দিতে চায় না।

আর কেউ না বোঝে না বুঝুক, নিজের ছেলে প্রাণতোষই যে তাঁর দুঃখ বোঝে না—এই তাঁর সবচেয়ে বড় দুঃখ। কমলা মনে করেছিলেন, তাঁর নিজের মত এত কষ্ট না পেলেও পৈতৃক ভিটে ছেড়ে যেতে ছেলে নিশ্চয়ই খানিকটা মুষড়ে পড়বে। কিন্তু কই, তার কোন লক্ষণই তিনি তার মাঝে দেখছেন না। নইলে ছেলে-মেয়ে-বউয়ের পক্ষে হয়ে কান্নার জন্য সে তাঁকে ধমকাতে পারে? তাঁর জিনিসপত্র গুছোতে বলে ওরা। সে কি অমনি সহজ? কোন্‌টি ফেলে কোন্‌টি সঙ্গে নেবেন তিনি।

সবচেয়ে মুস্কিল হচ্ছে নিজের মনের কথা খুলে বলবার উপায় নেই ওদের কাছে, বলতে গেলেই ওরা দেবে ধমক। তাই বসে বসে নিজের মনে কাঁদা ছাড়া আর উপায় কি।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কাল ভোরে চিরকালের মত বাস্তু ছেড়ে যেতে হবে। প্রাণতোষ আফিস থেকে ছুটি নিয়ে নিতে এসেছে সবাইকে, আর সব কিছু খুঁটিয়ে। এতদিন গভীর রাত্রে যে কান্নার সুর শুনতে পেতেন কমলা—আজ যেন তা সর্বক্ষণ শুনছেন। মাঝে মাঝে তাই পাগলের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠছেন তিনি। বাপের নির্দেশে রেখা বসে আছে ঠাকুরমার কাছে, কিন্তু স্নিগ্ধ কথা সে ঠাকুরমাকে একটিও বলতে পারছে না, তাঁর কান্না আর বিলাপ শুনে রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠছে তার মন। অথচ বাপের আদেশে বসে থাকতে হবে তাকে ঠাকুরমার কাছে, উঠতে পারবে না সে।

এমনি বিরক্তিকর কাজে বসে থাকা যে কত কষ্ট—বাবা মা তা কি বোঝেন? রেখা মনে মনে বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল তার বাপের বিরুদ্ধে। এমন সময় উঠানের কাঁঠাল গাছের ওপাশ থেকে শব্দ হল,—ও বউ, কই তুমি?

বাঁচলো রেখা : ন্যাড়ির মা—এসে গেছে।

কমলা ভারী গলায় উত্তর দিলেন, এস, বোন,—এস।

মালতী উঠান থেকেই কেঁদে উঠল : আর বউ,—কাল থেকে আমি আর কার কাছে আসপো।

রেখা বিরক্ত হয়ে বললে,—নাও, এখন যত পারো তোমরা কান্নাকাটি করো, কান্নার পাল্লা দাও তোমরা।

মালতী অন্ধকারে কোনরকমে বারান্দায় উঠে কমলার পাশে গিয়ে বসতেই রেখা যেন আবার কি টিপ্পনি কাটতে যাচ্ছিল,—কমলা তাকে ধমক দিয়ে বললে,—চুপ—চুপ—

এতক্ষণ এত বকর বকর করছিলে, এখন আবার চুপ কেন?

কানাই বাগ্‌দী গান গাইছে, একটু শুনতে দে—আর হয়ত····

কান্নায় ভারী হয়ে এল কমলার গলা। কানাই বাগদী তখন দরদী গলায় গেয়ে চলেছে—

···বন পোড়ে তাই সবাই দেখে
মনের আগুন কেউ না দেখে
(আবার) বনের আগুন নেভে জলে
মন-আগুন ত নেভে না!

কানাই পথ চলতে চলতে গান গাইছিল, গানের সুর তার ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল। কমলা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন,—তাই, বনের আগুন সবাই দেখে, মনের আগুন কেউ দেখে না।

মালতী অমনি বলে উঠল,—কেউ দেখে না, গো,—কেউ বোঝে না। ···ও বউ,—আমরা য্যাহোন কি করবো, তোমরা ত আমাগারে ছাড়ে চললে, এ বিজবন পুরীতি আমরা থাকব ক্যামন করে?

রেখা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, ভাল জ্বালায় পড়লাম ত,—আবার তুমি এসে আরম্ভ করলে,—একা ঠাকুমাকে নিয়েই পারছি না আমরা!

ও মা, দুখ্‌খু লাগে না আমাগারে! এতদিন পাশাপাশি ঘর করলাম, —দুখ্‌খু লাগে না! তোমার ঠাকুরমার তোমরা আর কয়দিন দেখিছ?— আমরা দেখতেছি—এতটুকু কালের থে। এক রত্তি বউ এল ঘরে, বারো বছরের মেয়ে,—তাই না বউ?

ওরা কি আর বুঝবে, বোন,—ওরা ভাবছে সহরে যাব, মনের আনন্দে ফ্যাশন করে বেড়াব, ইস্কুল কলেজে যাব, রেডিও শুনব, সিনেমা দেখব, এখান থেকে বেরুতে পারলেই বাঁচি। পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে যাওয়া যে কি কষ্ট তা ওরা কি বুঝবে?—ওর মা-বাবাই বোঝে না ত,—ও!

শুনে কোঁস করে উঠল রেখা: দেখ, ঠাকু'মা অমন কথাটি বলো না, আজই বিকেলে জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে মা বাবা—কত দুঃখ করছিল না?

কমলা মালতীর উদ্দেশে বললেন, শোন ত রাঙির মা, ওরা আমার ছেলে বউ আর ওদের দুঃখের সঙ্গে আমার দুঃখ সমান করে দেখে।

স্বাহো দিন!

আচ্ছা, বোন, তুমিই বল ত, তাই কি হয়?

স্বাহো দিন!

প্রাণতোষ আমার যখন ষোল বছরের তখন থেকে ঘর-ছাড়া। এখানকার পড়া শেষ করে ঐ যে বিদেশে গেল, তারপর কয়দিন আর সে এখানে বাস করেছে। বিদেশে গিয়ে পড়ার পর পড়া, তারপর পড়া, তারপর চাকুরি,—বাড়িতে রইল আর সে ক'দিন?···বউমাও ত প্রায়ই তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। বাড়ি আসা একবার ঐ আম-কালে, আর একবার পুজোর সময়,—নাতি নাতনী সব তাদের সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে, বলো তাদের কষ্ট আর আমার কষ্ট সমান?

স্বাহো দিন।

প্রাণতোষ তার নিজের ঘরে তখনও কি যেন গুছোচ্ছিল, মায়ের কথা শুনে বেরিয়ে এসে বলল, আচ্ছা মা, তুমি দিনরাত এই যে কষ্ট কষ্ট করছ, এসব শুনে আমার কেমন লাগে বল ত। বাস্তু ছেড়ে যেতে কি আমার কষ্ট হচ্ছে না? তোমার যেমন এ শ্বশুরের ভিটে, আমারও এ তেমনি বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে। তুমি এখন এ বাড়ির সবার বড়, তুমিই যদি এমন কর, তবে আর সবাই মন বাঁধবে কেমন করে বল ত।···যেতে যখন হবেই—তখন মন স্থির করে জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভাল নয় কি?

এই ত তোমরা গুছোচ্ছ বাবা, তোমরাই গুছোও, আমায় আর ওর মাঝে টেনো না—বলে' কমলা কাঁদতে সুরু করে দিলেন।

প্রাণতোষ বিরক্ত হয়ে বললে,—এই দেখ বলতে গেলাম ভাল কথা,—আর অমনি তুমি কান্না সুরু করলে।····তোমার ত কিছু নিজে দেখতে হবে না, তুমি হুকুম করবে, আমরা সেই সব গুছিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।

হাসালি, বাবা, হাসালি, এত দুঃখেও হাসি পাচ্ছে আমার। এত লেখাপড়া শিখেছিস তুই—

কেন, কি অন্যায় বলেছি আমি বলো ?

না, বাবা,—কিছু অন্যায় বলো নি তুমি, তুমি এখন এসো, রাঙির মা এসেছে, আজকের পর আর হয়ত ওর সঙ্গে জীবনে দেখা হবে না, দুটি সুখদুঃখের কথা বলি ওর সঙ্গে, তুমি এখন যা করছিলে তাই কর গিয়ে—

হাঁ, যাচ্ছি আমি। তোমার কি কি নিতে ইচ্ছে তাই বলে দাও,—তবে আমি যাচ্ছি। 'কিছু নিতে চাই না'—বলে অমনি গোঁ ধরে বসে থাকলে চলবে না।

ছেলের কথা শুনে রীতিমত বিরক্ত হয়ে কমলা ঠাকুরুণ বললেন, দেখ পানু, আমি বারণ করে দিচ্ছি তোকে, তুই আমাকে ঘাঁটাতে আসবি না।···এত টাকা পয়সা খরচ করে তোকে লেখাপড়া শিখিয়ে গেছেন উনি, এখন দেখছি সে সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে।

প্রাণতোষ কাতর হয়ে বললে,—শুধু শুধু চটছ তুমি, মা,—আমার কি কসুর হ'ল বলবে ত ?

আমি কি নিতে চাই—নিতে চাই যে বলিস, আমি যা নিতে চাই তোদের সাধ্যি কি যে তা পারিস।

পারি কি না—একবার বলেই দেখ না।

নিতে চাই আমি এই সমস্ত বাড়িখানা উঠিয়ে,—এই ঘরদোর এই মাটি, এই ভিটের গাছপালা,—এই সব।

তুমি পাগল হয়ে গেছ, মা।

তাই বলছি আমাকে ঘাঁটাতে আসিস না তোরা,····আর শুধু নিজের

ভিটে উঠিয়ে নিয়েও মন ভরে না আমার,—নিতে চাই আমি এখানকার —মাঠঘাট, পথ, বন, নদী, প্রতিবেশী সবাইকে। বল, পারবি তোরা এ সব নিতে ?

না, পারলাম না আমি তোমার সঙ্গে, তুমি যত খুশি বকর বকর করো পিসীর সঙ্গে।

তাই, বাবা, তুমি এসো,—ঘাঁটিও না আমায় আর, মাথাটা খারাপ করে দিও না।

প্রাণতোষ ভাবলে নিজের দুঃখ দিয়ে সত্যিই মায়ের ভিটে ছাড়ার দুঃখের তুলনা করা যায় না। রাঙির মা'র সঙ্গে কথা বলে যদি তাঁর মনের ভার একটু লাঘব হয়—এই ভেবে সে সেখান থেকে ধীরে ধীরে সরে গেল।

ছেলে চলে গেলে কমলা একটু গুম হয়ে বসে থেকে রাঙির মা'র কাছে আবার বলতে সুরু করলেন—

শোন, বোন,—ওরা আমায় জিজ্ঞাসা করতে আসে কিসের জন্ত আমার বেশি মায়া, ওরা না কি তাই সঙ্গে নেবে।—এসব পাগলের কথা নয় ?— এখানকার কোন জিনিসটা আমার ফেলবার বলো ?

ত্যাহো দিন।

শ্বশুরের নিজের তৈরী এ ঘরদোর, প্রায় একশ বছর আগে নীলকর সাহেবদের কাছ থেকে কেনা এ বাড়ির চার চারটে দরজা,—আর ঐ হাতীর মত কাঠের সিন্দুক, হাজার টাকা খরচ করলেও মিলবে এ সব, —বলো ?

ত্যাহো দিন।

আর সবার উপর এখানকার মাটি। ঐ তুলসীতলায় আমার শাশুড়ী রোজ পিদিম দিতেন,—আর ঐ ঠাকুর ঘরে করতেন তাঁরা রোজ পুজো-সন্ধ্যো।

মালতী কমলার কথা শুনে নিজের মনের আবেগ আর চাপতে না পেরে কেঁদে বলে উঠল,—আর বলো না, বউ, বলো না। তোমরা চলে গেলি আমরা থাকপো কেমন করে ?

কমলা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন, কেঁদ না, বোন,

—কেঁদ না, আমরা চলে গেলে কান্নার সময় অনেক পাবে, কিন্তু যতক্ষণ আছি, একটু বলতে দাও আমায়—

মালতী কি ভেবে নিজেকে সামলে নিলে। কমলা বলে চললেন,—

এই সব আশেপাশে আম কাঁঠালের গাছ দেখছ, রাঙির মা,—এরা তোমার এ বাড়ির দাদার ছ' মাসের বড়। উনি যে-বার হলেন, তার মাস ছয়ের আগে শ্বশুর ঠাকুর নিজের হাতে এগুলি লাগান। তোমার দাদা বলতেন, এই গাছগুলি আমার ভাই, এরা আমার দাদা, আর ঐ লিচুগাছ, জামরুল, লকেট,—আর আঁশফল গাছ তোমার দাদার নিজের হাতে লাগানো। তিনি বলতেন, এগুলি আমার সন্তান, আমার পান্থ আর মনোরমার মত—

মনোরমার কথা বলতে গিয়ে গলা ধরে এল কমলার, সেই ধরা-গলায়ই তিনি বলতে লাগলেন, আর মনোরমা,—আমার সোনার পিরতিমে মেয়ে—এ ঘরেই,···বোন, এই ঘর কি আমার ছেড়ে যাওয়া সহজ ? ঐ তুলসীতলায় বাপ আর মেয়ে এ বাড়ির শেষ শোওয়া শুয়েছে····

কান্না আর কিছুতেই রোধ করতে পারছিলেন না কমলা, তাই একটু চুপ করে নিজেকে সামলে নিলেন এবার, তারপর একটু পরে ধীরকণ্ঠে আবার সুরু করলেন,···আমার কি মনে হয়, রাঙির মা, জানো ?—আমার মনে হয়—এখনও যেন তাঁদের আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে এ বাড়ির আশেপাশে, আর ঘরে ঘরে। আজ এই ক'দিন ধরে আমি যেন আমার বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা শুনতে পাচ্ছি। ওরা বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন—ওঁদের ভিটে ছেড়ে আমরা চলে যাচ্ছি। ফিসফাস করে ওঁরা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করেন।

আহা,—করবেন না !····কত সাধের ভিটে তা'দের.—স্বর্গের থে'ই তাঁরা কষ্ট পান !

আরও দেখ, রাঙির মা,—ঐ সৈরভী আর তার বাছুরটা,···ওরা যে কি করবে ? বুঝতে পেরেছে, এর মাঝেই বুঝতে পেরেছে। মাঝে মাঝে কেমন অকারণ হাম্বা হাম্বা করে ডাকে, কাছে গেলে করুণ চোখে চেয়ে থাকে।

আহা অবোলা জীব !

নিজের হাতে ঘাস-জল-দেওয়া গরুর জন্য সজল হয়ে উঠল কমলার দুটি চোখ, গভীর করুণার সঙ্গে তিনি বলতে লাগলেন—

তোমরা জানই ত, বোন, ও কেমন দুরন্ত, ওর রোখ চাপতে ওর দড়ি ধরে রোখে এমন সাধ্য কারো নেই। বিরক্ত হয়ে গেল বছর দিলাম ওকে বিক্রী করে ও-পাড়ার মতি শিকদেরের কাছে। দুধ দুইয়ে দেখে নিয়ে গেল মতি। দুধ দেখে সে কত খুশি : দেশী গরুর সাড়ে তিন সের দুধ !....গরু ত নিয়ে গেল মতি, একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিনদিনের দিন দড়ি ছিঁড়ে সৈরভী বাড়ি এসে হাজির। পিছু পিছু ছুটে এল মতি শিকদের, বলে জ্যেঠাইমা, আপনার গরু আপনি ফেরত নিন, ও গরু বাড়ি রেখে আমি শেষে মহাপাতকের দায়ে ঠেকব ?

কেন মতি ?

আর বলবেন না, জ্যেঠাই মা, এই তিন দিন ত ও আমার বাড়ি গেছে, এ তিন দিনের মাঝে একটা খড় কুটো দাঁতে কাটে নি ও,—এক কোঁটা জল খায় নি,—মুখ উঁচু করে কেবল ডাকে হাম্বা,—হাম্বা—

মতির টাকা মতিকে ফিরিয়ে দিয়ে গোয়ালঘরে গিয়ে সৈরভীর গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগলাম,—কেমন করে তাকাতে লাগল ও আমার চোখের দিকে, ওর দুই চোখ দিয়ে টস টস করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল—

বলতে গিয়ে গলা ধরে এল কমলার। মালতী জিজ্ঞাসা করলে, কি করে যাচ্ছ ওকে—বিক্রী ?

না,—ওকে আমাদের প্রজা বাদল সর্দারকে দিয়ে যাওয়া হচ্ছে—

এমন করে কথা বলতে বলতে রাত্রি হয়ে গেল অনেক—কমলার কথা তবুও ফুরোয় না। শিবানী জলখাবার খেতে ডাকল শাশুড়ীকে। না তাঁর খিদে নেই, কমলা বকেই চলেছেন।

মা ডাকলে, রেখা, খেতে আয়—ঠাকুমাকে ডেকে নিয়ে আয়। রেখা খেতে যাবার আগে কমলার হাত ধরে টানলে, ঠাকু'মা এসো !—না তাঁর খিদে নেই।

অবশেষে প্রাণতোষ এসে একরকম ধমক দিয়েই মালতীকে বাড়ি

পাঠালে : মাকে পাগল করে না দিয়ে ছাড়বে না, তুমি—পিসী, যাও, পুলিন ডাকছে তোমায়, বাড়ি যাও !

উঠতে কি চায় মালতী ?—যাবার সময় কমলাকে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে সে বলে গেল, তোমরা ত চললে বউ, আমাদের দশা য়্যাহোন যে কি হবি ?....ক্যামন করে থাকপো আমরা য়্যাহানে, গাঁ যে খাঁ খাঁ করতিছে য়্যাহনই, তোমরা গেলি যে আরও কি হবি !

মালতী চলে গেলে প্রাণতোষ অনেক সাধ্যসাধনা করে, অনেক মাথার দিব্যি দিয়ে—মা কিছু না খেলে সে তিনদিন উপোস করে থাকবে —ভয় দেখিয়ে কমলাকে সামান্য একটু দুধ খাওয়াতে পারলে শুধু ।

কি নিতে চান জিজ্ঞাসা করলেই—মা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন দেখে প্রাণতোষ ও সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য করলে না ।

সে রাত্রে কমলার চোখে আর এক ফোঁটা ঘুম এল না। এই ঘরে তাঁর জীবনের কত মিলনান্ত আর বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হয়ে গেছে, একে একে সিনেমার ছবির মত ভেসে উঠতে লাগল তাঁর মনে—

ফুলশয্যার রাত্রে স্বামী তাঁর লজ্জা ভাঙিয়ে প্রথমে তাঁকে কি করে কথা বলিয়েছিলেন—সে কথা তাঁর মনে পড়ল, পাড়ার মেয়েরা সব আড়ি পেতে ছিল। স্বামীর প্রথম আদরের স্পর্শে তারা আর নিজেদের চাপতে না পেরে একসঙ্গে সব খিল খিল করে হেসে উঠেছিল।···

সেদিন থেকে সুরু করে স্বামীর ভালবাসার কত কথাই না কমলার মনে পড়ে।···একবার, মনোরমা হয় নি তখনও, কমলার তখন পূর্ণ যৌবন, স্বামী সাত আট মাস পরে বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরলেন। রাত্রে কমলা আলতা পরে পান খেয়ে ঘরে ঢুকলেন। খাটের কাছে আসতেই স্বামী অকস্মাৎ তাঁর আলতাপরা পা দুটি এমন জোরে ধরলেন নিজের বুকে চেপে যে—কমলা ত ভয়ে মরেন : সে কি। তাঁকে মহাপাতকের দায়ে ঠেকতে হবে যে !

তাঁর ভয়ার্ত কণ্ঠের উত্তরে স্বামী বলেছিলেন, মহাপাতক না, হাতী !···· দেহি পদ-পল্লবমুদারম্ !

কি ভুলতে পারেন সে সব কথা !

এ নিয়ে স্বামীকে সস্নেহ তিরস্কার করতে গেলে তিনি বলেছিলেন, অমনি সুন্দর দুটি পায়ে অমন আলতা পরে এলে পুরুষের মন যে কি করে পুরুষ হতে ত বুঝতে।

মনোরমা এই ঘরেই তার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। শেষ মুহূর্তের আগে সে কমলাকে ডেকে বললে, মা, তুমি আমার মাথায় হাত রাখ, আমায় আশীর্বাদ কর—

কমলা বলেছিলেন, কিছ্ছু ভয় নেই, মা, তুমি সেরে উঠবে।

না, মা, আমি সারতে চাই না, খোকন আমার মা মা বলে ডাকছে —আমি তাকে ছেড়ে আর থাকতে পারছি না···

এ ঘর ছেড়ে যাওয়া কি কমলার সহজ ?

সবচেয়ে বেশি মনে পড়তে লাগল কমলার—স্বামীর অন্তিম শয্যার কথা : এই ঘরের মেঝেতে শুয়েই তিনি কমলাকে বলেছিলেন, পানু চাকরি করে, বৌমা আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে ও হয়ত চিরকাল বিদেশেই থাকবে। আমার অনেক সাধের বাড়ি—এ বাড়ি তুমি কখনো ছেড়ে যেও না। এ বাড়ির উপর যে কি মায়া আমার গো, তা তোমরা বুঝবে না।

কমলা তার উত্তরে বলেছিলেন, আমি সব বুঝি, আমি নিজে ইচ্ছে করে তোমার ভিটে ছেড়ে কোনদিন যাব না, কিন্তু জানই ত আমি মেয়েমানুষ, পরাধীন—

শুনে স্বামী দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, পরাধীন, পরাধীন।

সারারাত ধরে কমলার মনে এই বেদনাই সবচেয়ে বেশি করে বাজতে লাগল : তিনি পরাধীন, পরাধীন, স্বামীর শেষ অনুরোধ তিনি রাখতে পারলেন না।

ভোর হবার অনেক আগে থেকেই যাত্রার আয়োজন চলেছে। নৌকা এসে গেছে ঘাটে, জিনিসপত্রও সব উঠে গেছে। বাড়ির লোকজনও অনেকে উঠেছে নৌকায়। বাদল সর্দার এসে গেছে, এরা চলে গেলে সৈরভী আর তার বাছুরকে সে নিয়ে যাবে। আর সবাই নৌকায় উঠলেও কমলা ঠাকরুণ তখনও ঠাকুর ঘরে বসে কাঁদছেন, আর নিজের

মনেই ঠাকুর দেবতার নাম আওড়াচ্ছেন। তাঁকে নিয়ে যাবার জন্তে—বাড়িতে রয়েছে শুধু তাঁর ছেলে প্রাণতোষ।

প্রাণতোষ শেষে অধৈর্য হয়ে বলে উঠল,—আর কত দেরী করবে, মা, বেরিয়ে এস, সবাই যে নৌকায় উঠে তোমার জন্ত অপেক্ষা করছে। মা, ও মা, শুনছ, আর দেরী করলে যে রোদ উঠে যাবে, মা, মহকুমায় গিয়ে আর বাস ধরতে পারব না।

আমি যে এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারছি না, বাবা, তোরা যা, আমি এইখানে থেকেই মরব।

পাগলামি করো না, মা, এসো, তুমি ত এখন আমার মেয়ে, যা বলব তাই শুনবে তুমি, লক্ষ্মী মেয়েটির মত!

শুনে কমলার কানে ভেসে উঠল—স্বামীর মৃত্যুশয্যার পাশে উচ্চারিত—তাঁর নিজের উক্তিরই প্রতিধ্বনি—কিন্তু জানই ত, আমি মেয়ে মানুষ, পরাধীন!

কমলা একটু চুপ করে থেকেই বললেন, হাঁ, বাবা শুনব বই কি!... এই আসছি আমি।

কমলা টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। প্রাণতোষ মা'র অবস্থা দেখে তাঁকে ডান হাতে জড়িয়ে নিয়ে বলল, হাঁ এসো,—গা কাঁপছে তোমার, মা,—আমার হাত ধরে এসো!

একটু এগিয়ে এসেই সামনে পড়ল একটা লিচুগাছ।

কমলা সেখানে গিয়ে আর নড়তে চান না, বলেন, দাঁড়া, এই লিচু গাছটা....এর নীচে বসে মনোরমা আমার মেটে ভাঁড় নিয়ে রান্নাবাড়ি খেলা করত, আর ঐ আমগাছটার আম লাল দেখে ছেলেবেলায় তুই ওর নাম রেখেছিলি, লালটোরা!

প্রাণতোষের মনটা মায়ের মনের ছোঁয়াচ লেগে ক্রমেই যেন কেমন হয়ে আসছিল, নিজেকে কোনরকমে সামলে নিয়ে সে বলল, নাও, এখন আর পুরানো কথা মনে আনে না, চলো, চলো মা, নইলে বড্ড দেরী হয়ে যাবে।

নৌকা ছাড়বার সময় আর সবাই ঘন ঘন দুর্গা নাম উচ্চারণ করলে—

কমলা শুধু চিত্রার্পিতের ন্যায় একদৃষ্টে ভিটের মা-টির দিকে চেয়ে রইলেন। নৌকার দাঁড় চলল ঝপ, ঝপ, ঝপ। কানাই বাগ্দী তখন দত্তবাড়ির ঘাটের পাশে 'বিত্তি' তুলতে গিয়ে গান ধরেছে—

মনের দুঃখ বলব কারে
ব্যথার ব্যথী নাই ঘরে,
ব্যথার ব্যথী যদি থাকত আমার
আমি কইতাম কথা তারে (গো)—

কমলার শীর্ণ দু'টি গণ্ড আবার চোখের জলে সিক্ত হয়ে উঠল। প্রাণতোষ কাতর হয়ে বললে, কেঁদ না মা, কেঁদ না—যাত্রা করে চোখের জল ফেলতে নেই।

এই আমি মুছে নিচ্ছি, বাবা।

কানাই তখন গানের শেষ কয় লাইন গেয়ে চলেছে—

ছিলাম রাজার রাজনন্দিনী
হলাম পথের কাঙালিনী (গো)—
আমি পথে পথে কেঁদে বেড়াই
হয়ে পথের কাঙালী রে।

কমলার চোখ আবার জলে ভরে উঠল।

ছি, মা, আবার কাঁদছো তুমি!

কমলা চোখের জল মুছতে মুছতে উত্তর দিলেন—এ নদীর জল কি মুছলে শুকায়, বাবা।

দাঁড় চলল, ঝপ, ঝপ, ঝপ!

শিবশঙ্কর

শিবশঙ্করকে আমি আজও ভুলতে পারিনি। তার কাহিনী শুনলে আপনাদের অনেকেও হয়ত কিছুদিন পারবেন না।

শিবশঙ্কর—এ নামটা শুনেই আপনাদের অনেকে হয়ত এ-ও মনে করতে পারেন, বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের সঙ্গে এ নামের বুঝি কিছু সম্বন্ধ আছে।

তা আছে, এবং আছে বলেই আপনাদের কাছে তার কাহিনী আমি আজ শুনাতে যাচ্ছি

আট নয় বৎসর আগেকার কথা,—অর্থাৎ সন তারিখ সঠিক মনে না পড়লেও এটুকু বেশ মনে আছে,—যুদ্ধ তখন সুরু হয়ে গেছে কিন্তু রেঙ্গুনে তখনও বোমা পড়েনি

বর্ষাকাল,—হয়ত আষাঢ় মাসই হবে। গুড়ি গুড়ি-বৃষ্টি পড়ছিল, আর আমি তখন দক্ষিণ কলিকাতার একটা বই-এর দোকানে দাঁড়িয়ে এ-ও-বই দেখছিলাম। দোকানের মালিক আমার বিশেষ পরিচিত—অনেকটা বন্ধু-শ্রেণীর বললেই চলে,—তা ছাড়া গল্প উপন্যাস লিখি বলে বেশ একটু খাতিরও করেন। তাই সময় পেলেই বিকেলের দিকে এখানে এসে দেখি নতুন বই কি এল,—পেলে মনের সাধে পাতা উল্টাই।

এমনি করে কি একখানা নবাগত ইংরেজি নভেলের পাতা উল্টাচ্ছিলাম,—এমন সময় দোকানের মালিক ধীরেনবাবুর ছোট ভাই হীরেন হঠাৎ বাইরে এসে বললে, এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা—মানে পরিচয় করতে চান।

গম্ভীর ভাবে মাথা দুলিয়ে বললাম,—বেশ ভাল কথা। বলে রাখা দরকার নতুন কোন ভদ্রলোক তখন আমার সঙ্গে পরিচয় করতে এলে আমার বেশ রোমাঞ্চ জাগত,—কারণ তখন এ কথা বুঝতে সুরু করেছি আমার সঙ্গে নতুন পরিচয় করতে আসা মানেই আমার লেখার কিছু তারিফ

করা, আর লেখকের জীবনে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে না।

হীরেন আমার সম্মতি পাওয়া মাত্র আবার গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই বেরিয়ে গেল, বই-এর পাতার উপর চোখ রেখে আমি তখন ভাবছিলাম—কেমন লোক হবেন এ ভদ্রলোক কে জানে।

হীরেনের সে ভদ্রলোক পাশেই কোন দোকানে হয়ত দাঁড়িয়ে ছিলেন, কারণ হীরেন ঘর থেকে বেরুবার প্রায় মিনিট খানেকের মধ্যেই তাকে এনে হাজির করলে। আমি তখনও গম্ভীর ভাবে বই-এর পাতা উল্টাচ্ছি।

আড়চোখে ভদ্রলোককে দেখে নেবার একটু ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু সেটা শোভন নয় বলে অপেক্ষা করাই সাব্যস্ত করলাম, কিন্তু অপেক্ষা করতে আর আমায় হ'ল না,—হীরেন আমাকে লক্ষ্য করে ভদ্রলোককে বলছে,—ইনি হচ্ছেন—

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক বলে উঠলেন,—জানি, প্রসিদ্ধ কথা শিল্পী সুনীল রায়,—নমস্কার।

আশ্চর্য হয়ে ফিরে দাঁড়ালাম : এ ত বয়স্ক লোকের কণ্ঠ নয়। আশ্চর্য এত হয়েছিলাম যে, প্রত্যভিবাদন জানাতে 'নমস্কার' বলতে হয়ত আমার একটু দেরীই হয়ে গেল।

তাকিয়ে দেখি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে বাইশ তেইশ বছরের একটি ছেলে হাতযোড় করে আমার দিকে সলজ্জ মৃদু হাসি হাসছে : আমি আপনার একজন অনুরাগী ভক্ত, অনেক লেখা পড়েছি আপনার, বড় ভাল লাগে আমার, লেখা পড়েই ইচ্ছা হ'ত···লোকের কাছে খবর নিয়ে রেখেছি অনেক আগেই, তারপর আলাপ—মানে—পরিচিত হতে ইচ্ছা হ'ল—তাই—

মনে মনে বললাম, কথা ত বেশ শিখেছ, ভাই, এই বয়সে এ রকম কথা ত বড় কেউ বলে না, মুখে বললাম, বুঝলাম—কিন্তু বড় বেশি বাড়িয়ে বলছেন যে আমায়।

শুনবার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা যেন তার একটু আঁধার হয়ে এল : না, না—একটুও মিছে বলিনি—সত্যিই আপনার লেখা আমার ভীষণ ভাল লাগে।

বুঝলাম, কিন্তু প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী-টিল্পী, ও সব কি, প্রসিদ্ধি আমি এখনও কিছুই লাভ করতে পারিনি, একটু আধটু লিখতে চেষ্টা করি—এই মাত্র।

ছেলেটির মুখখানা আবার খুশিতে ভরে উঠল : না, না, চারিদিকে আপনার নাম কেমন ছড়াচ্ছে তা জানেন না আপনি···আমাকে আর 'আপনি' বলে লজ্জা দেবেন না, 'তুমি' বলেই কথা বলবেন আমার সঙ্গে।

বয়স তখন আমার তিরিশ ছাড়িয়ে আরও দু'এক বছর এগিয়ে গেছে, সুতরাং বাইশ তেইশ বছরের ছেলের সঙ্গে অনায়াসে 'তুমি' বলে' কথা বলাও চলে, কিন্তু অত শীগ্‌গীর কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা তেমন ভাল বোধ করি না, তাই একটু গম্ভীর হয়ে বললাম, এই রকম কথা বলাই আমার অভ্যাস, সাধারণতঃ প্রথম আলাপের সঙ্গে যদি আমি দেখি মেয়েরা ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে—আর ছেলেরা হাফপ্যাণ্ট ছেড়ে ধুতি ধরেছে তা হলেই আমি 'আপনি' চালাই।

আমার কথাটা শুনে দেখলাম ছেলেটা একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল।

প্রথম দিনেই আর বেশি এগুতে দেওয়া ঠিক হবে না মনে করে বইয়ের দোকান থেকে সরে পড়বার উদ্দেশ্যে ধীরেনবাবুকে বললাম, ক'টা বাজে ?

ধীরেনবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, ছ'টা-দশ।

আসি—সাড়ে ছ'টায় আবার এক জায়গায় 'এনগেজমেণ্ট' আছে, নবাগত ছেলেটির দিকে চেয়ে বললাম, আচ্ছা চলি, নমস্কার।

নমস্কার !

—বলতে গিয়ে ছেলেটির মুখখানা যেন একটু আঁধার হয়ে এল : এত শীঘ্র আমাকে ছেড়ে দিতে হবে, হয়ত সে এটা আশা করেনি।

কাজের চাপে কয়েকদিন আর ধীরেনবাবুর দোকানে আসা হয়নি, চার পাঁচ দিন পরে আবার যেদিন এলাম, ধীরেনবাবু বললেন, সেদিনকার সেই ভদ্রলোক এর মাঝে দু'দিন এসে আপনার খোঁজ করে গেছে।

ভদ্রলোক ? —বলুন সেই ছেলেটি !

হাঁ, সেই ছেলেটি, ছেলেটির গুণ আছে মশায়, শুনলাম তার অনেক কথা : এতদিন উদয়শঙ্করের সঙ্গে দেশ-বিদেশে বেড়িয়েছে, নেচে বেড়িয়েছে তাঁর সঙ্গে।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, বটে !······আগে চিনতেন না বুঝি আপনি, আপনার ভাইয়ের সঙ্গে ত দেখি ওর বেশ ভাব !

হাঁ, ভাইয়ের সঙ্গে ভাব কিছুটা হয়েছে বটে, কিন্তু সে-ও বেশি দিনের কথা নয়, অল্প কয়েক দিন হ'ল ওঁর সঙ্গে ভাব হয়েছে, আর রকম দেখে মনে হয় আপনার সঙ্গে পরিচয় করবে বলেই ওকে বাগিয়েছে !

মনে মনে ভাবলাম, হতে পারে, হীরেনের বয়স ত পনের ষোলর বেশি নয়, ওকে যে-কোন কাজে লাগানো এমন আর কি আশ্চর্য ! উদয়শঙ্করের সঙ্গে নেচে বেড়িয়েছে শুনে ছেলেটির সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে নিজেই কৌতূহলী বোধ করতে লাগলাম ; বললাম, ছেলেটির সম্বন্ধে আর কিছু জানলেন ? —হীরেন জানে ?

না, হীরেনের সঙ্গেও ত বেশি দিনের পরিচয় নয়, তবে খবর নিয়েছি ছেলেটি এখন আছে রেল লাইনের ও-পারে এক আত্মীয়ের বাড়িতে।

এর পরেই আমার মনে হ'ল ধীরেনবাবুর কাছে ছেলেটির সম্বন্ধে একটু কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলেছি। প্রসঙ্গ চাপা দিবার উদ্দেশ্যে বললাম, যা'ক, তারপর নতুন বইটই কিছু আপনার এল ?—বলে ধীরেনবাবুর জবাবের অপেক্ষা না করে নিজেই বই-এর তাকের দিকে এগিয়ে গেলাম, ধীরেনবাবুও— কিছু কিছু এসেছে, এগিয়ে দেখুন—ব'লে হিসাবের খাতার দিকে নজর দিলেন।

বইয়ের তাকে বই নাড়তে নাড়তে ভাবছিলাম ছেলেটি আজ একবার এলে মন্দ হয় না, ওর সম্বন্ধে আরও কিছু জানা যায় : উদয়শঙ্করের দলে নাচত, সাধারণের দলে ত তবে ওকে ফেলা যায় না, সেদিন আর একটু আলাপ করাই দেখছি ভাল ছিল।

হঠাৎ কোন ফাঁকে আমার মুখ থেকে ধীরেনবাবুর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল, ছেলেটির নাম কি—জানেন ?

খাতার উপর থেকে মুখ না তুলেই ধীরেনবাবু উত্তর দিলেন, না, নামটা আর জানা হয়নি, জিজ্ঞাসা করতে ভুল হয়ে গেছে।

নিজের কৌতূহলের জন্ত আবার লজ্জাবোধ ফিরে এল আমার, সুতরাং সেদিন এ প্রসঙ্গ আর উঠল না।

সেদিন রাত্রে শুয়ে মনের রাশ যখন আল্গা করে দিয়েছিলাম, তখন আর আর দশটা ব্যাপারের সঙ্গে ছেলেটির চেহারাও আমার চোখের সামনে একবার ভেসে উঠল : ব্যাকব্রাশ করা চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছিল, ছেলেটি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল দোকানে। গায়ের পাতলা জামাটাও আধভেজা হয়ে গিয়েছিল, তার মাঝ দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটি নেটের গেঞ্জি। মেদবর্জিত ছিপছিপে গড়ন। গায়ের রঙ ফরসা, দাঁতগুলি সামান্য একটু উঁচু। সব কিছু মিলিয়ে চেহারাটা শিল্পীর মতই বটে : হবেই ত, উদয়শঙ্করের সঙ্গে অমনি নেচে বেড়ালে চেহারা ভাল না হয়ে যায়। আরও দশ কথা ভাবতে ভাবতে কোন ফাঁকে শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কাজের চাপে বইয়ের দোকানে আর কয়েকদিন যাওয়া হয়নি। ছেলেটির সঙ্গে আর দেখা না হওয়ায় তেমন করে আর তার কথা মনে পড়েনি। এমনি করে আর কয়েক দিন দেখা না হলে হয়ত তার কথা একরকম ভুলেই যেতাম।

কিন্তু তা আর হ'ল কই।

ছেলেটির সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন সাতেক পরে কলেজে থার্ড ইয়ারের একটা ক্লাস নিয়ে সবে প্রফেসার্স রুমে এসেছি, এমন সময় বেয়ারা একখানা স্লিপ নিয়ে এল—

শ্রীযুক্ত সুনীল রায়ের দর্শনপ্রার্থী

শিবশঙ্কর (শিল্পী)

চিরকুটখানা পেয়ে একটু অবাক হয়ে গেলাম : কই, কোন শিল্পীর সঙ্গে হালে ত আমার কোন কাজ কারবার নেই, কারও কাছে কোন ছবি করতেও ত দিইনি, তা ছাড়া আমার কোন গল্পের বইও সম্প্রতি সচিত্র করে প্রকাশ করবার আয়োজন চলছে না, তবে কে এ। যাই হ'ক শিল্পী যখন দর্শনপ্রার্থী, তখন দেখা তাকে আমার দিতেই হবে, বেয়ারাকে বললাম, নিয়ে এস বাবুকে,—বলেই আমাদের বিশ্রামাগার থেকে নিজেও বেরিয়ে এলাম : কি জানি কে, কি প্রয়োজনে এসেছে, কথাবার্তা অপরের অসাক্ষাতে হওয়াই ভাল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই দর্শনপ্রার্থী শিল্পীকে নিয়ে বেয়ারা ফিরে এল।

কিন্তু এ কি, এ যে সেই ছেলেটি! ছেলেটি উদয়শংকরের দলে ছিল, 'শিবশঙ্কর' নামের তাৎপর্য এবার বোধগম্য হ'ল।

ঈষৎ অপরাধীর মত সলজ্জ হাসি হেসে দু'হাত জোড় করে নমস্কার করে ছেলেটি বললে, বিঘ্ন করলাম বোধ হয়।

না, আমার লিজার আছে এখন। কি খবর বলুন।

আপ্যায়নের হাসি হাসতে গিয়ে ছেলেটির ঈষৎ উঁচু দাঁতগুলি প্রায় বেরিয়ে পড়ল। লক্ষ্য করলাম দাঁতগুলি বেশ সাদা। দেখে মনে হয় বেশ দস্তুর মত মাজাঘষা হয় ওদের। ছেলেটি বললে, বইয়ের দোকানে যান না আপনি কয়েকদিন, বাড়ির ঠিকানা জানিনা আমি, ধীরেনবাবুও বলতে পারলেন না। তাই কলেজের ঠিকানায় এসেছি।

শিবশঙ্করের কথা বলার ভঙ্গী এবং মুখের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল আমার পিছু পিছু ছুটে বিঘ্ন করার জন্যে একটা অপরাধ-বোধ সে কিছুতেই এড়াতে পারছে না, তাই তাকে একটু স্বস্তি ও সাহস দিবার জন্যে মৃদু হেসে বললাম, আমার সৌভাগ্য। সেদিন ধীরেনবাবুর কাছে আপনার কথা কিছু কিছু শুনলাম, আপনি নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরের দলে ছিলেন?

শিবশঙ্করের ঈষদুন্নত দাঁতগুলি আবার প্রকাশিত হয়ে পড়ল: আজ্ঞে হাঁ।

ক' বছর?

তা বছর দুয়েক হবে।

ছেড়ে এলেন কেন?

সে সব অনেক কথা, ধীরে সুস্থে বলব একদিন।

বুঝলাম শিবশঙ্কর আমার সঙ্গে শুধু আজ কথা বলতে আসেনি, একটা স্থায়ী ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র সে স্থাপন করতে চায়, একথা তারই পূর্বাভাস। বললাম, বেশ তাই হবে, আজ কি খবর?

সলজ্জকাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে সে বললে, আপনার বাড়ির ঠিকানাটা?

ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বললাম—নং সাদার্ণ পার্ক।

লেকের একেবারে কাছে ?

হ্যাঁ—কাছেই।

সাহিত্যিকের একেবারে উপযুক্ত স্থান,—বলে শিবশঙ্কর নিজেই একটু হেসে নিলে।

আমি আর কোন জবাব দিলাম না।

আমায় চুপ থাকতে দেখে—দেখি ও আবার তার স্বচ্ছন্দ ভাব হারিয়ে ফেলছে। এরপর একটু চুপ করে মুখে ঈষৎ অপরাধীর ভাব ফুটিয়ে শিবশঙ্কর বললে, মাঝে মাঝে যদি আপনার ওখানে যাই আমি, বিরক্ত হবেন আপনি ?

গম্ভীর হয়ে বললাম,—আসবেন।

কখন একটু অবসর থাকে আপনার ?

বিকেলে সন্ধ্যার কাছাকাছি আসবেন, রবিবার হ'লে সকালের দিকে।

আমার এ কথাটা শুনে দেখি শিবশঙ্করের মুখ খুশিতে ভরে উঠল।

এরপর কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে বিশেষ বিবেচকের মত সে বিদায় নিল। যাবার সময় সে নমস্কার করে বলে গেল, বিশ্রামের ব্যাঘাত করে গেলাম আমি, সেজন্য ক্ষমা—

না, না, কিছুই হয়নি। এখানে এসে পড়াতে না হলেই আমাদের বিশ্রাম।

তা'হলে আসছে রবিবার সকালে আসছি আমি আপনার ওখানে।

আসবেন।

নমস্কার।

নমস্কার।

ছেলেটি চলে যাবার পর মনে হচ্ছিল, ছেলেটির কথাবার্তা বলার ভঙ্গী একেবারে নিখুঁত। হবেই ত—কত বড় শিল্পীর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে এতদিন।

রবিবার সকালে বসে আমার এক উপন্যাসের প্রুফ দেখছিলাম, এমন সময় শিবশঙ্কর এসে মধুর হেসে নমস্কার করে দাঁড়াল। ও যে আসবে সে কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে থাকলে হাতের কাজ হয়ত সেরে রাখতাম। যাই হ'ক আমার তখন মাত্র একটা গ্যালি মাত্র বাকী আছে।

বললাম, আপনি একটু বসুন, প্রুফটা আমার হয়ে এল, সেরে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বলা যাবে, পাবলিশারের লোক সকালে এসেই নিয়ে যাবে কিনা।

হাঁ, হাঁ, সেরে নিন, সেরে নিন।

সামনে শ্রীনিকেতনের মোড়াটা দেখিয়ে বললাম, বসুন, আর টেবিলের উপকার কাগজ দেখিয়ে বললাম, ততক্ষণ চোখ বুলান—

শিবশঙ্কর মৃদু হাসি দিয়ে আমার কথার জবাব দিলে, কিন্তু আসন গ্রহণ সে আর করলে না, ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল আমার ঘরটা। প্রথমে নজর দিল শ্রীনিকেতনের মোড়ার উপরকার সেই ছবিটায়, তারপর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল দেয়ালের ছবি, আলমারীর বই, তাকের ম্যাগাজিন, তারপর খুঁটিনাটি—সব, মায় টেবিলের উপকার লেখার প্যাড, কলমদানি, পিনকুশান আর জেম্‌ক্লিপের ছোট বাক্‌সোটা পর্যন্ত।

মিনিট দশেক পরে আমার প্রুফ দেখা শেষ হ'ল, কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে শিবশঙ্করের উদ্দেশ্যে বললাম, তারপর, কি খবর বলুন!

শিবশঙ্কর মোড়াটায় বসে মৃদু হেসে বললে, দেখছিলাম আপনার ঘর, সুন্দর, মানে সুন্দর সাজানো, দেয়ালের ছবিগুলিও একেবারে 'চয়েচেস্ট' এই 'হোপ' আর 'মোনালিসা'র ছবি আমি কলকাতায় কত দোকানে চেষ্টা করলাম, জোটাতে পারলাম না, আপনি কোথেকে আনলেন, বিলেত?

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, না, এইখানেই পাওয়া যায়, কিন্তু তা আর বলতে সুযোগ পেলাম না, শিবশঙ্করই কেমন অদ্ভুত আবদারের সুরে বলে বসল, এটা কিন্তু আপনার অন্যায়, হাঁ, দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ছবি রেখেছেন অথচ তাঁদের পাশে নিজের নেই!

কথাটা শুনবামাত্র মনে হ'ল, এ বলে কি, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ছবির পাশে আমার ছবি। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে এ কথা বলতে হয়, কথাটা শুনে খুশিও লাগছিল একটু মনে: ; লেখার দিক দিয়ে নামটার সত্যিই বোধ হয় আমার একটু হয়েছে…

শিবশঙ্কর আমার ঘরের দেয়ালের দিক আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বললে,

এমন সুন্দর 'পানিং' করা ঘর আপনার, অথচ একখানা ফ্রেস্কো করান নি ?

শিবশঙ্করের কথাবার্তা শুনে তারপর আমার ক্রমেই শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছিল, কি 'টেস্ট' ছেলেটির ! হবেই ত, কেমন লোকের সঙ্গে ঘুরাফিরা করছে এতদিন ! উদয়শঙ্কর নৃত্যশিল্পীইত শুধু ন'ন, ছবি অঁকতেই ত তিনি প্রথম বিলেত যান। যাই হ'ক শিবশঙ্করের সম্বন্ধেও ক্রমেই আমি বিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠতে লাগলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, উদয়শঙ্করের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হ'ল কি করে, প্রথম আলাপ হ'ল কি করে ?

শিবশঙ্কর শুনে আশ্চর্য হয়ে হেসে বললে, বা: উনি যে আমার বাবার বন্ধুর ছেলে, তা ছাড়া আমার বাবার কাছেই যে উনি প্রথম ছবি আক্‌তে শেখেন।

ও:, আপনার বাবাও তা হ'লে আর্টিষ্ট বলুন !

মৃদু সলজ্জ হাসি হেসে শিবশঙ্কর বললে, হ্যাঁ, বাবা একদিন বেশ নাম করা আর্টিষ্ট ছিলেন, ইন্দোরের কোর্ট-আর্টিষ্ট ছিলেন তিনি।

বললাম, এমন বাপের ছেলে আপনি, নিজেও কিছু ছবি আঁকা শিখলেন না কেন তাঁর কাছে, উদয়শঙ্কর শিখে নিতে পারলেন, আর আপনি তাঁর ছেলে হয়ে—

কথাটা আর শেষ করতে দিলে না শিবশঙ্কর, মৃদু রহস্যময় হাসি হেসে বললে, কিছু কিছু শিখেছি বই কি।

কিছু কিছু শিখেছেন ? তাই বলুন !

শিবশঙ্করের উপর শ্রদ্ধা আমার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। সে আমার কথার সূত্র ধরে বলে গেল, এইসব করতে গিয়েই ত লেখাপড়া তেমন হ'ল না।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, নাই বা হ'ল লেখাপড়া, যা সব শিখেছেন আপনি, তার কদর কি একটু কম। নাচতে শিখেছেন, ছবি আঁকতে শিখেছেন····

ঈষৎ বিষণ্ণ সুরে শিবশঙ্কর বললে, গান শিখতে লক্ষ্ণৌ যাবার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাবার শরীর খারাপ, যাওয়া আর হ'ল না।

কি অসুখ তাঁর ?

বেশি চোখের পরিশ্রম করলে যা হয়, চোখ খারাপ, দৃষ্টিশক্তি ক্রমেই হারিয়ে ফেলছেন, বলেন, কি জানি, হয়ত অন্ধ হয়ে যাব, এ সময় তুই আর দূরে যাসনি খোকা।

এখন কোথায় আছেন তিনি ?

আমাদের দেশের বাড়িতে, বাঁকুড়ায়।

এমনি করে শিবশঙ্করের সঙ্গে তার সাংসারিক কথাও অনেক হ'ল। দেশে তাদের মস্ত বাড়ি, পুকুর, জমি জমা। মা নেই, বিধবা পিসী বাপের দেখা শুনা করেন। কলকাতায় একটা ভাল বাড়ি বা ফ্লাট পেলেই বাপকে কলকাতা নিয়ে আসবে শিবশঙ্কর চিকিৎসা করাতে।

সাংসারিক কথা বললে বলতেই ঠাকুর চা দিয়ে গেল, এই ফাঁকে প্রসঙ্গ পালটাবার সুযোগ পেলাম, এ কথা ও কথার পর বললাম, গান শিখতে লক্ষ্ণৌ যেতে চেয়েছিলেন যখন, তখন গানও একটু আধটু অভ্যাস আছে নিশ্চয়।

মৃদু হেসে শিবশঙ্কর বললে, অল্প একটু আধটু আছে, নইলে দিন আর কাটে কি করে বলুন, গান একটু আধটু গাই আর মাঝে মাঝে একটু চামড়ার কাজ করি।

চামড়ার কাজ ?

হাঁ, ভেড়ির চামড়ার উপর নানারকম ছবি আঁকার কাজ, তা ছাড়া নানা রকম ব্যাগ বানানো—

আমি রীতিমত আশ্চর্য হয়ে শিবশঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম : ছেলেটি সত্যিই অসাধারণ!

শিবশঙ্কর পূর্ব কথার সূত্র ধরে বললে, প্রথমে এসেই আপনার এই মোড়ার উপরকার ছবি দেখছিলাম আমি, এর ডিজাইনে মস্ত বড় এক ভুল আছে।

কি ?

বলাকার পাশে মেঘের কিছু একটা স্কেচ্ থাকলে ভাল হ'ত।

শুনে মনে হ'ল, সত্যিই ত, এ কথা ত আগে কোনদিন আমার মনে হয় নি।

ধরিত্রী কাগজের সম্পাদক অনেকদিন ধরে একটা গল্প চাইছেন, দিতে পারিনি, তা ছাড়া পর পর দু'খানা পত্র পেয়েও অভদ্রের মত তার উত্তর দিই নি, তাই সম্পাদক মহাশয় সশরীরে এসে হাজির হলেন, ভর্ৎসনা করতে নয়, গল্পের জন্য মৌখিক তদ্‌বির করতে—সুতরাং—

শিবশঙ্করের সঙ্গে অন্য কথা আর সেদিন কিছুই হ'ল না, সে একটু পরে নমস্কার করে বিদায় নিলে : আসছে রবিবারে আবার আসব।

নিশ্চয় আসবেন।

ধরিত্রীর সম্পাদক এ সময় আসায় ভালই হয়েছিল, শিবশঙ্কর অন্তত দেখে গেল—সাহিত্যিক সুনীল রায়ের সঙ্গে শুধু শিল্পী শিবশঙ্করই দেখা করতে আসে না।

ধরিত্রীর সম্পাদক চলে গেলে কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে শিবশঙ্করের কথাই মনে পড়তে লাগল : ছেলেটি [illegible], এই বয়সে যথেষ্ট শিল্প চর্চা করেছে, পরের রবিবারে—এলে আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে ওর সকল কথা।

কিন্তু শিবশঙ্করের দেখা পাবার জন্যে রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'ল না : মঙ্গলবারে সন্ধ্যার একটু আগে চা খাওয়া শেষ করে লেকে একটু বেড়াতে যাওয়ার আয়োজন করছি—এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম : সুনীল বাবু আছেন, সুনীল বাবু····

দরজা খুলে দেখি—শিবশঙ্কর।

আপ্যায়নের হাসিতে ঈষদুন্নত দাঁতগুলি অনাবৃত হয়ে পড়ল তার : দেখা হবে তা আর ভাবি নি, মনে হয়েছিল—বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন—

হাঁ, যাবার আয়োজনই করছিলাম।

বেশ ত, চলুন, আমিও একটু বেড়িয়ে যাই আপনার সঙ্গে।

বসবেন না ?

না, আর বসে লাভ কি, বসব আসছে রবিবারে এসে। একটু দরকারও আপনার কাছে আছে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলাম।

শিবশঙ্কর হেসে বললে—সে সব রবিবারেই হবে।

বেশ।

চাকরকে ডেকে দরজা বন্ধ করতে বলে বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গে শিবশঙ্কর।

লেকে বেড়াতে বেড়াতে এ কথা ও কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম, গান ত করেন, স্ট্রিংড্ ইনস্ট্রুমেণ্ট কিছু অভ্যাস টভ্যাস আছে ?

সন্ধ্যার ম্লান আলোতে—ম্লান হাসি ফুটে উঠল শিবশঙ্করের মুখে : সব আশা কি মানুষের মেটে, তিমিরবরণের স্বরোদ শুনে ইচ্ছা হয়েছিল তারের যন্ত্র কিছু একটা বাজানো শিখি, কিনেছিলামও একটি গীটার বিলেত থেকে, কিন্তু বিলিতি শেখা আর হয়নি, মাঝে মাঝে মন খারাপ হলে—রাত্রে ছাদে বসে দিশী গানেরই সুরু তুলি তাতে !—বেশ লাগে।

গীটারটা এখানে,—না বাড়ীতে ?

না, এখানে আছে !

লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে—মাঝে মাঝে মনে হয় একটা তারের যন্ত্র থাকলে বেশ হত, খানিকটা বাজিয়ে নিতাম।

শিবশঙ্কর অমনি বলে উঠল, বেশ ত রেখে যাব আমার গীটারটা আপনার কাছে, বাজাবেন।······কিছু কিছু অভ্যাস আছে ত ?

সে সামান্য, একরকম কিছুই নয়,—কিন্তু আপনারটা দিতে হবে না, আমিই একটা কিনব, আপনি সঙ্গে গিয়ে শুধু বেছে দেবেন।

শিবশঙ্কর হেসে বললে, সে হবে'খন।

এমনি করে নানা কথার ভিতর দিয়ে শিবশঙ্কর ক্রমেই আমার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। পরের দিন বুধবারে সে আমার ওখানে আসেনি বটে—কিন্তু বৃহস্পতি—শুক্র—দু'দিনই পরপর এসেছে, বলে, সন্ধ্যা হ'লেই কি যেন নেশার মত টানতে থাকে এ দিকে, এ কি বলুন ত।····

রবিবারে শিবশঙ্কর যখন এল, হাতে দেখি তার একতাড়া লেখা ও বড় সাইজের সুন্দর একটা আনকোরা ব্যাগ। ব্যাগের উপরে সুন্দর একটা ছবি : শকুন্তলা একটা গাছের ডাল নামিয়ে আশ্রমমৃগকে খাওয়াচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে আদর জানাতে গালটা রেখেছে হরিণটার কাঁধের উপর, আরামে চোখ বুজে হরিণ পাতা চিবুচ্ছে—

দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলাম একবার ব্যাগটার উপর।

শিবশঙ্কর লেখার ফাইল আর ব্যাগটা আমার টেবিলের উপর রেখে অভি-বিনয়ের সঙ্গে হেসে বললে, একটু সময় নষ্ট করব আপনার।

বিনয় রেখে—বলে ফেলুন, যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে আমাদের।

কিছু লেখা এনেছি আমার, অবসর মত যদি চোখ বুলান।

মনে মনে আশ্চর্য হয়ে বললাম, এ যে দেখছি একেবারে সব্যসাচী : আপনি লেখেনও না কি, কই তা'ত বলেননি ?

সলজ্জ হাসি হেসে অতি সন্তর্পণে শিবশঙ্কর লেখার ফাইলটা এগিয়ে দিলে, আমি সেটা হাতে তুলে নিতে গিয়ে বললাম, এগুলি ব্যাগটার মাঝে পুরে আনেন নি কেন ?

সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসি হেসে—হাত জোড় করে শিবশঙ্কর বললে, আমার একটা প্রার্থনা আছে আপনার কাছে, আপনি কিন্তু তাতে—'না' বলতে পাবেন না।

কি ব্যাপার ?

সেদিন দেখে গেছি—আপনার লেখাগুলো এলোমেলো—ছড়িয়ে আছে টেবিলের উপর...... ফুলস্কেপ কাগজে লেখেন আপনি, তাই ঠিক সাইজ মত এই ব্যাগটা তৈরী করে এনেছি আপনার জন্যে।

—এই বলে ভক্ত যেমন করে অঞ্জলি দেয়—ঠিক তেমনি করে সেটা তুলে দিলে সে আমার হাতে।

এত বড় শ্রদ্ধার দান গ্রহণ করতে—আমি 'না' বলতে পারলাম না, কিন্তু বিস্মিত হয়ে বললাম, বলেন কি, এর মাঝে তৈরী করে ফেললেন আপনি ?

বিনীত কণ্ঠে শিবশঙ্কর বললে, দুদিনের বেশি ত লাগে না, ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মত একটা ছবিও করে দেব আপনাকে।

বিস্ময়ে আনন্দে রোমাঞ্চ জাগছিল আমার মনে।

এরপর খুলে বসলাম তার লেখার ফাইল, তাতে রয়েছে—গোটা কুড়িক কবিতা। হাতের লেখাও বেশ ঝরঝরে। প্রথম কবিতা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, এযে একেবারে পাকা হাত, মশায়,

কতদিন সাধনা করেছেন এ নিয়ে, আপনি যে একেবারে সব্যসাচী দেখছি।

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল শিবশঙ্করের মুখ: অল্প কয়েক বছর হ'ল, আরও আছে, আপনার ভাল লাগে ত পরে দেখাব।

ভাল—খুব লাগবে, আপনি দেখাবেন।

শিবশঙ্কর এবার বিনীত কণ্ঠে বললে, আপনার পড়তে অসুবিধা হ'লে আমি পড়ে শুনাতে পারি।

পড়তে আমার কিছুই অসুবিধা নেই, দিব্যি মুক্তোর মত লেখা আপনার। তবে পড়তে চান আপনি পড়ুন, কবির মুখে কবিতা শোনার একটা বিশেষ আনন্দ আছে,—বলে তার ফাইলটা তার দিকে এগিয়ে দিলাম।

শিবশঙ্কর স্বরচিত কবিতার প্রায় গোটা পনের পড়ে শোনালে—গলাটাও বেশ মিষ্টি, তবে—একটু ভাঙা ভাঙা।

বললাম, আবৃত্তিও ত বেশ করতে পারেন মনে হচ্ছে, কিন্তু গলা ভেঙেছে কেন—গান গেয়ে ?

সলজ্জ হাসিমুখে উত্তর দিলে, হাঁ, কয়েকদিন একটু বেশি মাত্রায় চলেছে।

একদিন শোনান না গান।

বেশ—হবে, তবে গানে আমি তেমন কিছু ওস্তাদ নই কিন্তু, জানি সামান্য—কিছু আধুনিক—কিছু রবীন্দ্রনাথের।

তারপর হঠাৎ বলে বসল, আচ্ছা সুনীল বাবু, আপনার মেয়ে নেই কোন ?

না, ঐ একটি ছেলে, কেন বলুন ত ?

থাকলে আমি তাকে নাচ শেখাতাম।

হেসে বললাম, কে জানত—জীবনে আপনাকে এমনি করে পাব, জানলে না হয় ভগবানের কাছে একটা মেয়েই চাইতাম।

শিবশঙ্করকে সেদিন আমার স্ত্রী সুলতার সঙ্গে পরিচয় করে দিলাম। সুলতা তাকে নিজের হাতে খাবার তৈরী করে খাওয়ালে।

এর পর প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই শিবশঙ্কর আমার এখানে আসত, লেকে

বেড়ানোর পর কোন কোন দিন তাকে আমার এখানে আমন্ত্রণ করে এনে আমার নতুন লেখা শুনাতাম, কারণ, অল্পবয়স্ক সাধারণ লোক বলে ত তাকে আর মনে করতে পারি না, সে একজন পাকা শিল্পী।

সন্ধ্যাকালে বেড়াতে গিয়ে সে আমাকে অনেক দিন রেষ্টুরেণ্টে নিয়ে দস্তুরমত খরচ করে খাওয়াত।

একদিন খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, উদয়শঙ্করের সঙ্গে ত এতদিন নেচে বেড়ালেন—টাকা পয়সা কিছু রাখতে পেরেছেন ?

আছে কিছু সামান্য।

কত ?

হাজার পাঁচেক আছে এক ব্যাঙ্কে, আপনাকেই শুধু বললাম, বলবেন না যেন কাউকে।

কাকে আর বলতে যাচ্ছি।

না, মানে মা'র সঙ্গে যদি কোন দিন দেখা হয়ে যায়; কোনক্রমে প্রকাশ পায় না যেন তাঁর কাছে!

মা!—তবে যে সেদিন বললেন, মা আপনার নেই, মারা গেছেন, বিধবা পিসীমা আপনার বাবাকে দেখাশুনা করেন।

না, আমার আপন মা নয়, যে বাড়িতে আমি এখন আছি, সেই বাড়ির কর্ত্রীকে আমি মা ডাকি। আমার বাবার বন্ধুর স্ত্রী। তিনি আমায় একরকম আপন মায়ের মতই ভালবাসেন।

কোথায় কোন্ বাড়িতে থাকেন আপনি, ঠিকানা কি ?

শিবশঙ্কর প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলে, তারপর বললে ঠিকানা।

বললাম,—একদিন যেতে হবে আপনার ওখানে।

শিবশঙ্কর বললে বটে, বেশ ত, সে ত সৌভাগ্যের কথা, মা খুশি হবেন আপনাকে দেখে ; আপনাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন তিনি, আপনার অনেক লেখা পড়েছেন কিনা।

কিন্তু মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল না সে খুশি হয়েছে। সুতরাং রেল লাইনের ওপারে ওদের বাড়িতে যাবার চেষ্টা আর আমি করি নি।

হয়ত কোন দিনই যেতাম না,—কিন্তু ভাগ্যচক্রে ব্যাপার একটু অন্য

রকম হয়ে গেল : দিন সাতেক পরে শিবশঙ্কর যখন আমার এখানে এল—মুখখানা দেখি তার শুকনো।

কি—অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?

একটু জ্বর-ভাব হয়েছে, খাইনি সারাদিন কিছু।

আজ আর না এলেই হত, শুয়ে থাকলেই পারতেন।

ম্লান হাসি হাসল শিবশঙ্কর : পারি না, সুনীলবাবু,—সন্ধ্যা হলেই কি যেন নেশার মত টানতে থাকে, না এসে পারি না।

এর পরে প্রায় দিন দশেক আসেনি শিবশঙ্কর, সুতরাং বাধ্য হয়ে খোঁজ করতে শেষে আমি ওর মায়ের বাড়িতে গিয়েই হাজির হলাম।

শিবশঙ্কর আমাকে দেখে ঠিক খুশি হল, না সন্ত্রস্ত হ'ল—ঠিক বুঝে উঠলাম না, হয়ত বা দুই-ই হ'ল।

ওর মা বাড়ি ছিলেন না, তাঁর ছেলেপিলের সঙ্গে আলাপ হ'ল।

শিবশঙ্কর জ্বর থেকে উঠে তখন সবে দু'দিন হ'ল ভাত খেয়েছে। পাশেই একটা হারমোনিয়াম ছিল, দেখে বললাম, কি, দু'একটা গান শোনাবেন নাকি ?

ম্লান হাসি হেসে শিবশঙ্কর বললে, বোধ হয় পেরে উঠব না, শরীর দুর্বল, তবে আমার এক ছাত্রীর নাচ দেখতে চান তো দেখাতে পারি।

বেশ ত, তাই দেখান না !

শিবশঙ্কর অমনি ডাকলে, মালা—

বছর নয়েকের হৃষ্টপুষ্ট একটি মেয়ে এগিয়ে এল। শিবশঙ্কর তাকে বললে, যাও, ঘুঙুর পরে এস, নাচতে হবে তোমায়—

মালা অতি অনুগত ছাত্রীর মত তখনই ঘুঙুর পরতে চলে গেল, আর শিবশঙ্কর কি ভেবে উঠে পাশের ঘরেই তাকে অথবা আর কাউকে কি বলতে গেল।

আমার নজর পড়ল তখন ঘরের ছবির দিকে ! পাশেই—একখানা নৃত্যরত উদয়শঙ্করের ছবি, আর দুখানা চামড়ার উপরে কাজ। বুঝলাম, এ দু'খানি শিবশঙ্করেরই আঁকা। ছবি সুন্দর,—একখানায় একটি হিন্দুস্থানী নারী কলসী মাথায় জল নিয়ে চলেছে; আর একখানায়—বনপথে তিনটি

শাবক সঙ্গে একটি হরিণী।

শিবশঙ্করের সঙ্গে মালা ঘুঙুর পরে ঘরে এল, আর এল মালার দু'টি বোন, আর এদিকে মালার দাদা সুধীন আনল আমার জন্তে খাবার ও চা।

শিবশঙ্কর ধরলে হারমোনিয়াম—মালার বোন দুটি ধরলে গান, আর সেই সুরের তালে তালে মালার নৃত্য সুরু হল। মালা নাচল অতি প্রচলিত সাধারণ দুটি নাচ, আরতি নৃত্য ও সাঁওতালী নাচ, আজকাল ঘরে ঘরে মেয়েরা যা শেখে। আমি মনে করেছিলাম উদয়শঙ্করের শিষ্যের কাছে যখন এ শিখেছে, তখন নতুন কিছু দেখব।

যা'ক, নাচের শেষে যথারীতি মালাকে আমি প্রশংসা করলাম। শিবশঙ্করের গান শুনব বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তার শরীর যা দুর্বল তাতে গান গাইতে আর অনুরোধ করা যায় না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার গীটারের কথা। বললাম, গীটারটা একটু বাজিয়ে শুনান না, ওতে ত আর শারীরিক জোর দরকার হয় না—

আমার কথা শুনে মালা আর তার বোনেরা নিজেদের মাঝে কানে কানে কি যেন বলাবলি করতে লাগল, শিবশঙ্কর একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, আমার দুর্ভাগ্য, সেটা আজ দিন দশেক হল বিজয় নিয়ে গেছে—

বিজয় কে ?

আমার এক বন্ধু—বিজয়শঙ্কর,—নৃত্যশিল্পী বিজয় শঙ্করের নাম—

বলতে হ'ল, শুনেছি মনে হচ্ছে, কিন্তু নাচ দেখবার সৌভাগ্য হয়নি আমার।

আহা,—বড় সুন্দর নাচে।

এর পর আর দুই একটা কথা বলে অসুখ সারলেই—মানে গায়ে বল পেলেই শিবশঙ্করকে আসতে বলে আমি সেদিনকার মত বিদায় নিলাম।

দুই তিন দিন পরেই শিবশঙ্কর এল, হাতে তার মাসিক পত্রিকা : স্বর্ণবীণা —। মুখখানা বড় হাসি হাসি।

কি ব্যাপার কি, বড় খুশি দেখায় যে।

শিবশঙ্কর স্বর্ণবীণাটা আমার হাতে দিলে, খুলে দেখি তাতে ওর এক কবিতা বেরিয়েছে, দেখে আমারও বড় আনন্দ হ'ল—বললাম, 'চিয়ারিও'

—দ্বার ত খুলে গেল, এবার দু'হাতে চালান,…যাই বলেন নাম করবেন আপনি, মশায়, শিল্পের আর কোন দিক বাদ রাখলেন না আপনি দেখছি—

মৃদু হেসে সে উত্তর দিলে আপনাদের পাশে শুধু একটু বসতে চাই, শুধু এই, আর কি ?

এবার গল্প উপন্যাসে হাত দিন আর কি, ও আর বাদ থাকে কেন ?

শুনে শিবশঙ্কর কথা না বলে শুধু মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

এরপর দিন পনেরর মাঝে কয়েকটা জিনিস আদানপ্রদান হয়েছে আমাদের মধ্যে। শিবঙ্কশর দিয়েছে আমায় বাঁধানো চামড়ার উপরে আঁকা—একখানা চন্দ্রমল্লিকার ছবি আর সেই গীটার। গীটারটা আমি কিছুতেই নিতে চাই নি, কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়বে না,—বলে, লেখার ফাঁকে ফাঁকে বাজাবেন আপনি আর মনে পড়বে আপনার এক অযোগ্য বন্ধুকে—

সে কি মশায়, আবার চলে যাচ্ছেন নাকি আপনি উদ[illegible] দলে ?

শিবশঙ্কর হেসে বলে, না, তবে চিরদিন যে আপনার পাশে থাকতে পাব, তা ত না-ও হতে পারে।

শিবশঙ্কর এখনই অবশ্য কোথায়ও যাচ্ছে না, তবে বিদায়ের প্রসঙ্গ তোলাতেই মনটা কেমন হয়ে গেল। বললাম, সে কথা ঠিক, কিন্তু কথা দিন আপনি, যদি কোথাও যান—তবে আপনার গীটার আপনি নিয়ে যাবেন—

শিবশঙ্কর মাথা নেড়ে বললে, না, না, এ গীটার আমি আপনাকে 'প্রেজেন্ট' করছি, কোন অবস্থাতেই ফিরিয়ে নেওয়া এ চলবে না।

এমনি করে অনেক কথা কাটাকাটি হ'ল। শেষে বাধ্য হয়ে—ছবি ও গীটার দুই-ই হাত পেতে নিতে হ'ল আমায়।

আমি ওকে কিছু দেব দেব মনে করেও কিছু দেওয়া হচ্ছিল না, ও নিজেই একদিন আমার লেখা দু'খানা বই নিয়ে গেল, ও দুইখানা নাকি তার পড়া হয়নি, আর একদিন চেয়ে গেল আমার একখানা ফটো,—বলে গেল এ থেকে দুখানা বড় করে আঁকবে ও, একখানা থাকবে ওর কাছে, একখানা দেবে আমায়। ঐ বয়সের ঐ রকম ছবি একখানাই মাত্র আমার

ছিল, বললাম, সাবধান, হারায় না যেন।

বললে, পাগল, আপনার থেকে আমার কাছে বেশি সাবধানে থাকবে!

শিবশঙ্করের সঙ্গে জীবনে আমার এই শেষ কথা।

এর পর কয়েকদিন শিবশঙ্কর আর আসছে না দেখে একটু চিন্তিত বোধ করছিলাম, একদিন গিয়ে খোঁজ করে আসাও উচিত বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু কাজের তাগিদে এক মুহূর্তও সময় পাচ্ছিলাম না। তখন পুজার আগে —দিন পনেরর মাঝে এক পাবলিশারকে একখানা নভেল দিতে হবে।

সুতরাং ইচ্ছা থাকলেও শিবশঙ্করের ওখানে যাওয়া আর আমার হয়ে ওঠেনি। নভেল আমার প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, উপসংহারের মুখ —তাই খুব জোর কলম চালাচ্ছিলাম। সকাল বেলার দিকে ঘরের দুই দরজাই বন্ধ করে অবিরত লিখে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ঘরের বাইরের দরজায় করাঘাত হ'ল, দুম্, দুম্, দুম্

কে?

আবার করাঘাত হ'ল দুম্, দুম্—

এবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম, কে?

গম্ভীর নারীকণ্ঠে উত্তর এল, দরজা খুলুন।

বিশেষ বিরক্ত হয়ে দরজা খুললাম, ঘরে প্রবেশ করলেন বছর চল্লিশ বয়সের এক মহিলা, এঁকে আমি আগেও দেখেছি, প্রায়ই সাইকেলে যাতায়াত করেন বালীগঞ্জের পথে। দেখেছি, অথচ পরিচয় নেই, নামও জানি না।

মহিলা সাইকেলটি গেটের গায়ে ঠেসান দিয়ে রেখে ঘরে ঢুকেই বললেন, আপনি সুনীলবাবু?

হাঁ।

নমস্কার।

নমস্কার।

মনের বিরক্তি মনে চেপেই বলতে হ'ল, বসুন।

হাঁ, বসব বই কি, দু মিনিট বসব বলেই এসেছি, আপনার কাজের বিঘ্ন না করে আমার উপায় ছিল না।

... চাইলাম।

মহিলা—উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে উঠলেন, মুক্তির কোন খবর রাখেন আপনি ?

মুক্তি, কে মুক্তি ?

ইদানীং আপনার কাছে প্রায়ই আসত, তার অসুখ হলে তাকে দেখতে গিয়েছিলেন—আপনি আমাদের বাড়ীতে। আমি তার মা ?

ওঃ—শিবশঙ্করের কথা বলছেন ?

শিবশঙ্কর ?—কে শিবশঙ্কর ?

কেন আপনার ঐ ধর্মছেলে, উদয়শঙ্করের দলে ছিল না, নাম ওর শিবশঙ্কর নয় ?

ফুঃ, শিবশঙ্কর !—উদয়শঙ্করকে কোনদিন চোখে দেখেছে ও ?

তবে ?

তবে টবে পরে হবে, ওর কোন খোঁজখবর জানেন আপনি ?

না, ও ত দিন পনের এখানে আসে না। আমিই ওর খোঁজ করতে যাব ভাবছিলাম।

আর খোঁজ করছেন, পাখী শিকলি কেটেছে।

মানে ?

মানে—আজ চার দিন হ'ল সে আমার মেয়ের হারটা নিয়ে—তার জিনিসপত্র নিয়ে সটকেছে, দুধ দিয়ে কাল সাপ পুষেছিলাম আমি····

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, ও আপনার মেয়ের হার চুরি করে নিয়ে গেল ?

চুরি নয়, বাটপাড়ি, হারটা মেরামত করতে দেওয়া হয়েছিল ওর কাছে; ও বলত, ওর না কি কোন জানা ভাল স্যাকরা আছে ?

মনে মনে ব্যথিত হয়ে বললাম, আশ্চর্য, আমি ভাবতেই পারছি না, এমন দরদ দিয়ে কবিতা লিখতে পারে যে—

মহিলাটি চেয়ারে একটু ঠেসান দিয়ে বসেছিলেন, আমার কথা শুনে একেবারে সিধে হয়ে উঠলেন : কবিতা, কবিতা আবার লিখল কবে ওর নির্মলবাবু বলে এক ভদ্রলোক কবিতা লেখেন, তাঁর কবিতার খাতা চেয়ে

নিয়ে এসে নিজের নামে ছাপিয়ে দিয়েছে স্বর্ণবীণা নামে এক মাসিক পত্রিকায়,—তাই নিয়েই তো গোলমাল শুরু—

উত্তেজিত নারীকণ্ঠ শুনে সুলতাও এগিয়ে এসেছে ঘরে।

বললাম, গোলমাল—কি হ'ল তা নিয়ে ?

মহিলা বললেন, তিনি এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে, শাসিয়ে গেছেন, তারপর উকিলের চিঠি দিয়েছেন—পাঁচশো টাকার দাবীতে, নইলে মোকদ্দমা করবেন তিনি।....কোথায় গেল সে বলুন ত ! মনে করেছিলাম আপনার এখানে এসে একটা কিছু পাত্তা মিলবে।

ওর বাড়ীর ঠিকানা ত আপনি জানেন, সেখানে একবার খোঁজ করুন না ?

সেখানে কি আর যাবে, আবার কোথায় গিয়ে কার সঙ্গে মা মাসী পাতিয়ে নেবে – ঐ ওর কাজ—

সুলতা অবাক হয়ে শুধু শুনছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বিজয়শঙ্করের কথা, বললাম, বিজয় বলে তার এক বন্ধু আছে, তার কাছে গিয়ে দেখুন ত ?

মহিলাটি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সোজা হয়ে বললেন, এই দেখুন তার কথা বলতে ভুলেই গেছি, তার কাছেও গিয়েছিলাম—ঠিকানা জানতাম না, নির্মলবাবুর কাছে ঠিকানা জেনে তার কাছে গেছি, ক্ষতি করেছে তারই সব চেয়ে বেশি, কতকগুলি সুন্দর সুন্দর লেদার গুডস্ এনেছিল তার কাছ থেকে, সেগুলি বিক্রী করে মেরে দিয়েছে, তা ছাড়া তার সব চেয়ে ক্ষতি হচ্ছে—তার কাছ থেকে একটা দামী গীটার এনেছিল, সেটাও কোথায় বিক্রী করে গিয়েছে। বিজয়বাবু ত এর পালানোর কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। চামড়ার জিনিস। তার নিজের হাতের তৈরী, না হয় কিছু টাকা লোকসান হ'ল—কিন্তু গীটারটা ছিল—তার একেবারে প্রাণের জিনিস—বাজাবে বলে এনে শেষে এই কাজ।

সুলতা আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। আমি মৃদু হেসে মহিলাটিকে বললাম,—দেখুন মুক্তির মা—

মহিলাটি বিরক্ত হয়ে বললেন, আর মুক্তির মা নয়, ডাকতে হলে জেনে

রাখুন আমার নাম কমলা দেবী—

মৃদু হেসে বললাম, বেশ, শুনুন কমলা দেবী—আপনার বাড়ীতে থেকে আপনার যে ক্ষতি সে করে গিয়েছে—তা পুরণের ব্যবস্থা আমার হাতে নেই বটে, কিন্তু বিজয়বাবুর ক্ষতিপুরণ কিছুটা হয়ত আমি করতে পারব।

মানে ?

মানে হয়ত বিজয়বাবুরই হাতে তৈরী লেদার গুডসের গোটা দুয়েক জিনিস আমার কাছে আছে, আনকোরা নতুনই আছে,—ও বলেছিল ওর নিজের হাতের তৈরী।

পাগল ! ও কোনদিন লেদার গুডস্ করবে ?

আর সব চেয়ে বড় কথা তাঁর গীটারও আছে আমার কাছে।

দেখুন ত, দেখুন ত কি পাজী—কতয় বিক্রী করেছে সে আপনার কাছে ?

বিক্রী করে নি, এ সবগুলিই আমি বিজয়বাবুকে ফেরত দিতে চাই, পারেন ত তাঁকে একবার আসতে বলবেন।

কমলা দেবী উত্তেজিত হয়ে বললেন, আজ সন্ধ্যায়ই নিয়ে আসব তাঁকে আপনার কাছে।

হাত জোড় করে বললাম, আজ সন্ধ্যায় নয়, কাল সকালে আসবেন, ঠিক এই সময়।

পরদিন বেলা সাড়ে আটটার কাছাকাছি বিজয়বাবুকে সঙ্গে করে এলেন কমলা দেবী। খবর পেয়ে সুলতাও এসে জুটল বৈঠকখানা ঘরে।

বিজয়বাবুর দেখলাম সত্যিই শিল্পীর মত চেহারা, বয়স সাতাশ আটাশ, মুখখানা হাসি হাসি।

বিজয়বাবু আমাকে ও সুলতাকে নমস্কার করে চেয়ারে বসতেই আমি সেই দুটি লেদার গুড্স ও তাঁর গীটারটা এনে তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

বিজয়বাবু সশ্রদ্ধ নমস্কারের সঙ্গে সেগুলি গ্রহণ করে বললেন, বড়ই লজ্জার কথা—এমনি অপ্রীতিকর ঘটনার ভিতর দিয়ে আপনার সঙ্গে পরিচয় হল, আপনার লেখার আমি একজন অনুরাগী ভক্ত, আলাপ করবার ইচ্ছা অনেক দিনই ছিল, কিন্তু কি দুর্দৈব, শেষে—

—না, না, তাতে কি হয়েছে—। এরূপ একটা ঘটনা না হলে হয়ত আপনার সঙ্গে দেখাই হ'ত না।

হেসে উঠলেন বিজয়বাবু: সাহিত্যিক কিনা, কথায় পারবার উপায় নেই···এগুলি দিচ্ছেন ত আমায়,—কত টাকা এর জন্য নিয়েছিল সে আপনার কাছ থেকে, সেটা—

'নট্ এ ফারদিং'—এগুলি নিজের বলে উপহার দিয়েছিল আমায়, বলে একটু হাসলাম আমি।

কমলাদেবী বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হাসছেন আপনি, একটুও রাগ হচ্ছে না আপনার, বুঝছেন না—কি 'রাসকেল' ওটা!

সুলতাও আমার হাসি দেখে বিরক্ত হয়ে তাকাচ্ছে আমার দিকে।

ঠাকুর এসে চা দিয়ে গেল।

বিজয়বাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, গীটারটা আমি ফেরত নিয়ে যাচ্ছি—ওটা আমার এক ইটালিয়ান সাহেবের কাছ থেকে কেনা, টাকা দিলেই অমনটি আর পাবার উপায় নেই, কিন্তু লেদার গুডস্ দুটি ফেরত নেব না আমি, ও দুটো আপনাকে প্রেজেণ্ট করে যাচ্ছি আমি।

হাত জোড় করে বললাম, মাপ করবেন।

কেন, এ আনন্দটুকু আমায় পেতে দেবেন না?

ইচ্ছা হয় অন্য কিছু দেবেন আপনি আমায়, মাথা পেতে নেব—এ দুটি নয়।

সুলতা কমলাদেবীকে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা মুক্তিবাবু কি ছবি আঁকতে পারতেন?

কিছ্ছু না।

তবে—বড় করে ছবি করবেন বলে যে—এঁর একটা ফটো নিয়ে গেলেন।...ও ছবিটা ত আর তোমার নেই, তাই না?

চোখ ইশারায় সুলতাকে—এ সব কথা তুলতে মানা করলাম।

সুলতা তা লক্ষ্য না করেই কমলাদেবীকে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, ওর বাবা কি ইন্দোরে কোর্ট আর্টিস্ট ছিলেন?

বিরক্ত হয়ে মুখ-চোখ বিকট করে কমলাদেবী উত্তর দিলেন—মিছে

কথা বলতে একটুও বাধে না ওর। ওর বাপ হচ্ছেন বাঁকুড়ার একজন ফোটোগ্রাফার, চিরকাল সেখানেই কাটিয়ে গেলেন।

আমি বললাম—নাচ-গান বোধ হয় ও একটু জানে।

নাচ-টাচ কিছু জানে না, গান একটু আধটু জানে—তারই ত' টিউশন করে দু'-চার টাকা পেত।

কিন্তু আপনার মেয়ে মালাকে নাচ শিখিয়েছে ত ঐ-ই ?

পাগল ! মালা নাচ শিখেছে তাদের নাচের স্কুল থেকে।

ঘৃণায় আর রাগে বিকৃত হয়ে উঠেছে কমলাদেবীর মুখ—সুলতারও দেখি তাই—মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে গেল—বাপরে, কি মিথ্যাবাদী। অল্প থেকে রক্ষা পাওয়া গেল।

বিজয়বাবুই শুধু মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না—কিন্তু মুখের ভাবে তার বেশ বোঝা যাচ্ছিল, ক্রোধ-বিরক্তির সঙ্গে একটা ঘৃণার ভাবই জাগছে তাঁর মনে।

সেদিন ওরা বিদায় নেবার বেলায় বিজয়বাবু উত্তেজনাহীন শান্ত মুখেই নমস্কার জানিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু কমলাদেবী রীতিমত বিরক্ত হয়ে কণ্ঠে শ্লেষ ছড়িয়েই বলে গেলেন,—আশ্চর্য আপনার ধৈর্য, সুনীলবাবু,—এমন একটা স্কাউণ্ড্রেলকে আপনি একটু ঘৃণা করেন না—এত সব কাণ্ড করে গেল সে—অথচ একটুও রাগতে দেখলাম না আপনাকে—আচ্ছা, আসি নমস্কার।

ওরা চলে গেলে সুলতা একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে—বাব্বা,, আচ্ছা পাখোয়াজ ছেলের পাল্টানে পড়া গেছল—অল্প থেকে বিদায় হয়েছে তাই রক্ষে।

সুলতা আমার কাছ থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে—একটু পরেই চলে গেল। আমি বসে বসে কিছুক্ষণ শিবশঙ্করের কথাই ভাবতে লাগলাম—

ওদের কাছে সে স্কাউণ্ড্রেল, রাসকেল, চোর, বাটপাড়, মিথ্যাবাদী—ওরা তাকে ঘৃণা করে—কিন্তু আমি ?—তার কথা ভাবতে গেলেই মনে হয় সে বলছে—না এসে থাকতে পারিনে—সন্ধ্যা হলেই কি যেন নেশার মত টানে—যেন বলছে—আপনাদের পাশে শুধু বসতে চাই। অপরাধ সে

করেছে—কিন্তু কেন ? সেকথা ভাবতে গেলে অন্তরটা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে আমার !....সে হয়ত ভাবত, এই রকম একটা 'পোজ' না নিলে আমি তাকে পাত্তাই দেব না—অথচ আমার পাশে এসে বসা তার চাই-ই চাই ।

এমনি করে ভাল আমায় কয়জন বেসেছে ? মিথ্যা কথা সে বলেছে—অপরের কবিতা চুরি করেছে—কিন্তু কেন ?

দীর্ঘ আট-নয় বছর কেটে গেছে—কিন্তু সেই মিথ্যাবাদী বাটপাড় ছেলেটিকে আমি আজও ভুলতে পারি নি ।

বড় ছবি করে দেবে বলে আমার যে ফোটো নিয়ে গেল সে—এখন তার অর্থ আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার ।

পাশের বাড়ির বৌ

আমার ঘরের জানালা খুললেই বউটিকে চোখে পড়ে। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মেয়ে, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, একটু রুগ্না অথবা বেশি পরিশ্রম করে বলে তাতে একটু মালিন্যের ছোপ পড়েছে।

নারকেল, বকুল আর শিরিষ গাছের জটলা ছাড়া কাছে আর দ্রষ্টব্য কিছু নেই বলে ফিরে ফিরে ঐ বউটির দিকেই নজর পড়ে। দেখে দেখে ওর দেহের প্রতিটি রেখা, হাবভাব আমার মনে আঁকা হ'য়ে গেছে, কথাবার্তা অনেক আমি মুখস্থ বলতে পারি।

বউটির টিকালো নাক, লম্বা মুখ, চোখে মুখে একটা শান্তশ্রী। কথা কম বলে। মুখে একটা বিষাদের ছায়া: সারাক্ষণ কি ভাবে কে জানে?

গল্প সাধবার জন্য অথবা কোন জরুরী লেখা শেষ করতে মাঝে মাঝে আমি খুব সকালেই উঠি, কিন্তু ওর কাছে আমি প্রতিদিনই হারি; আমি যত সকালেই উঠি না কেন, উঠে দেখি ও আমার আগে উঠেছে, আর শুধু উঠেছে নয়, উঠে ওর দিনের কাজ অনেকটা শেষ করে ফেলেছে। ওর উঠোন ঝাঁট দেওয়া, বারান্দা ধোয়া, সিঁড়ি ধোয়া হয়ে গেছে, উনুনে ধোঁয়া উঠছে।

ক্রমে সূর্য ওঠে, সুলতা বিছানায় আড়মোড়া ভেঙে চোখ রগড়ে আমার দিকে চেয়ে বলে, কি গো, ঝি এল?

এসেছে, এইবার উঠে পড়, ত্যাখো তোমার পাশের বাড়িতে উনুনে আঁচ পড়ে গেল।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঠোঁট উলটায় সুলতা, একটু ব্যঙ্গের হাসি খেলে যায় চোখে। সুলতা কেন যে ওকে পছন্দ করে না—বুঝতে পারি না: এমন লক্ষ্মী বউ!

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি—পাশের বাড়ির বউটি তখন রান্নাঘর থেকে এক পেয়ালা গরম চা হাতে দ্রুতপদে শোবার ঘরে ঢুকছে। আর এমন দ্রুতগতি ওর—শরীরটা অমন হালকা বলেই বোধ হয়।

কণ্ঠস্বর কানে আসে : ওগো শুনছ, চা এনেছি, ওঠো, শুনছ ওগো !

স্বামী সুদর্শনবাবু—'বেড্-টি' হাতে পেয়ে উল্লসিত মনে নিশ্চয়ই উঠে পড়েন—তারপর,—সেটা আর আমার চোখে পড়ে না, মনে মনে কল্পনা করে নি। কানে আসে একটি অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর : টুকু, এই টুকু, উঠে পড় এইবার, লক্ষ্মী মেয়ে ওঠো, তোমার খাবার হয়ে গেছে, এই টুকু—

টুকু বউটির একমাত্র মেয়ে, বয়স ছয় সাত, পুরো ডাক নাম টুকটুক, মায়ে আদর ক'রে ডাকে—টুকু।

সদ্য ঘুমভাঙা অলস-মন্থরগতি মেয়ের হাত ধরে বউটি রান্নাঘরে নিয়ে যায়, তারপর নিজে হাতে তার হাতমুখ ধুইয়ে খেতে দেয় এবং তারই পাশে নিজে চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে বসে।

চা-খাওয়া শেষ হ'তে না হ'তে শোবার ঘর থেকে ডাক আসে, ওগো আমার দিয়াশলাই আর সিগারেট দিয়ে যাও।

সিগারেট আর দিয়াশলাই কোন ঘরে কত দূরে আছে জানি না, শুধু এইটুকু বুঝি সুদর্শনবাবুর কষ্ট ক'রে ততদূর যাবার মতলব নেই। পরক্ষণেই দেখি বউটি চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে ছুটে আসছে স্বামীর নেশার সরঞ্জাম এগুতে।

সিগারেট ধরিয়ে স্বামী পায়খানা যান—আর এদিকে বারান্দায় এক বালতি জল, আর মগের পাশে সাজানো থাকে—টুথব্রাশ, পেষ্ট আর জিভছোলা।

সুদর্শনবাবুর ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যের তুলনা ক'রে মনে মনে দুঃখও পাই। সত্যি কী ভাগ্যবান সুদর্শনবাবু। ঝি-চাকর আমার অবশ্য আছে স্বীকার করি, ফরমাস করলেই সব কিছু কাজ পাওয়া যায়, কিন্তু প্রিয়জনের কাছ থেকে এমনি করে না চাইতেই পাওয়ার মাঝে রোমাঞ্চ নেই কি ? মনের দুঃখ মনে চেপেই দিন কাটাই, সুলতা একদিন একটা সিগারেট পর্যন্ত এগিয়ে দেয়নি আমায়। সময় পেলেই চুল আঁচড়ানো, মুখে স্নো ঘষা, সিনেমা দেখা আর নভেল পড়া—আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মোটা হওয়া। সংসারে দু পয়সা বাঁচুক, একটু উন্নতি হ'ক—সে দিকে তার একটুও খেয়াল আছে বলে মনে হয় না।

কিছু আর বলি না—বলে কি হবে—শুনে হয় বিদ্রূপের হাসি, নয় ত মুখভার। ও দুটোর একটাও আমার ধাতে বরদাস্ত হয় না।

সুলতার স্বভাবের এদিকটা আমায় এমন করে পীড়া দিত না—যদি না পাশের বাড়ির ঐ বউটার কাজকর্ম না দেখতাম আমি। ঐ ত মরা হাড় —কিন্তু দিনরাত কি খাটুনিই খাটে!

বাড়িতে ঝি চাকর কিছুই নেই—অথচ সব কাজ চলে যাচ্ছে—যেন একটা তেল দেওয়া মেসিন: একটু উচ্চবাচ্য নেই। মাছ কোটা তরকারি কোটা, কয়লা ভাঙা থেকে আরম্ভ করে কাপড় কাচা, ইস্ত্রি করা স্বায় স্বামীর জুতো ব্রাশ করা পর্যন্ত চালাচ্ছে ঐ পাকাটির মত বউটি।

সুদর্শনবাবু যে অমন মুটিয়ে যাচ্ছে—আমার মনে হয়, তার কারণও ঐ বউ। নিজের কাজের একটু ভাগ স্বামীকে দিলে স্বামীর অমন মেদবৃদ্ধি হ'ত না। কাজের কিছু ভাগাভাগি করলে দেহের ওজনেরও হয়ত কিছু ভাগাভাগি হ'ত।

ওদের কাণ্ড দেখে আমার নিজের গায়েই জ্বালা বোধ করতাম। একবার ত ভদ্রলোককে আমি এ নিয়ে এক রকম বলতে গিয়ে থেমে যাই। বউটি তখন সবে ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠেছে, উস্কোখুস্কো চুল, চোখ বসা। তাই নিয়েই বউটি উনুন ধরিয়ে চা ক'রে স্বামীকে চা দিয়ে নিজে রান্নাঘরে চা খেতে বসেছে—এমন সময় স্বামী ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছেন, ওগো আমার দিয়াশলাই আর সিগারেট দিয়ে যাও।

এতদিন চোখের সামনে ঘুরাফিরা করতে দেখছি—তা ছাড়া সবে অসুখ থেকে উঠেছে, বউটির জন্য হঠাৎ কেমন একটা সহানুভূতি বোধ করলাম যেন। ভাবলাম—সুদর্শনবাবুর সঙ্গে আলাপ ত আছে, সুযোগ মত একান্তে ডেকে একটু বুঝিয়ে বলব।

অভিপ্রায়টা সুলতার কাছে জানাতে সে আমাকে এক রকম শাসনের ভঙ্গীতেই বলল, খবরদার, এ সব করতে যেও না।

কেন?

কেন আবার কি, ঐ বউটাই পাজী, স্বামীকে কিছু, ছু করতে দেবে না,

সুদর্শনবাবু কিছু করতে গেলে কি কাণ্ডটাই না করে।……কি যে লাভ এতে, খেটে খেটে কি ছিরিই হচ্ছে!

বুঝলাম ব্যাপারটা: সুলতার মনোভাব বুঝে মনে মনে হাসলাম। জগতে সবাই মনে করে সে ঠিক পথেই চলেছে—ভুল করে অপরে।

—আর সত্যি বউটারও দোষ আছে। অতই বা কেন বাপু। স্বামী অফিসে চলে গেলে মেয়েকে খাইয়ে তার কাপড় ধোবে, গেঞ্জি বালিশের ওয়াড়ে সাবান দেবে, নর্দমা ঘষবে—আরও কত কি করে—তার হিসেব আর রাখি না। মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা সেরে আবার যখন লিখতে বসি, সুলতা তখন খোলা নভেল আর খোকনের পাশে ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমোয়, কিন্তু জানালা খুললেই দেখি বউটি তখন কয়লা ভাঙছে বা কাঠ কুচুচ্ছে। তখনও স্নান হয়নি তার।

এমনি দিনের পর দিন।

গোটা পাঁচেকের পরে স্নান খাওয়া সেরে বারান্দায় বসতে দেখা যায় বউটিকে—পাশে বই সেলেট নিয়ে টুকু। এ কাজটাও কি স্বামীকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায় না?

আসল ব্যাপারটা যে কি, সত্যিই বুঝি না। সংসারটাকে কি এমনি করেই ভালবাসতে হয়, নিজে কি কিছুই নয়? একটু আমোদ আহ্লাদ কি থাকতে নেই জীবনে!

সিনেমা ঘর এখান থেকে মিনিট দশেকের পথ। মাঝে মাঝে কত ভাল বই আসে। সুলতার ত একটাও বাদ যায় না, মাঝে মাঝে সে দোতালা থেকেই ডাকে, ও দিদি যাবেন?—'শহর থেকে দূরে' এসেছে এখানে—খুব ভাল বই।

বউটি হয়ত তখন কয়লা ভাঙছে, কাজ করতে করতেই ম্লান হেসে উত্তর দেয়, আর ভাই, শহরে থেকেও শহর থেকে দূরেই তো আছি।

তার দরকার কি, শহরে থাকলেই ত হয়—আসুন না, অত পচা সংসারী হ'য়ে কি হবে, চক্ষু বুজলেই ত—

বউটি কাজ করতে করতে মুখ না তুলেই উত্তর দেয়,—না, ভাই, উনি আসবেন খেটেখুটে—আর একদিন ছুটির দিনে দেখা যাবে।

কথাগুলো শুনে মনে মনে তারিফ করি বউটিকে—হাঁ, এ ত ঠিকই বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সুলতার উপর চিত্ত একটু বিরূপ হয়ে ওঠে, মনে মনে বলি, ভাখো, একবার দেখে যাও—সচ্ছল সংসার ওদের, নিজেদের বাড়ি—তবুও কত খাটে বউটা, লক্ষ্মী আসে ত এমনি ঘরেই আসে। আর তুমি? দিনরাত আরাম, পাউডার স্নো, নভেল, সিনেমা, সাজ-গোজ আর ঘুম। সত্যি—কি ভাগ্য আমার! আবার মুখে একটু আপত্তি জানাবার উপায় নেই, অমনি বাঘের মতন হুঙ্কার দিয়ে উঠবে অথবা চোখ ভুরু কুঁচকে মুখভার ক'রে বসে থাকবে। যা'ক ভেবে লাভ নেই, যার যা ভাগ্য!

বউটিকে তারিফ করবার সত্যিই অনেক কিছু আছে: এতদিন দেখছি ওদের, এর মাঝে স্বামী স্ত্রীকে কই তেমন ঝগড়া করতে দেখলাম না, অথচ সুলতার সঙ্গে আমার লেগেই আছে, অবশ্য আমাদের মিটে যায়ও শীগ গির, কিন্তু ঝগড়া ত! সুলতাকে একদিন বললাম কথাটা—কলহের পর সন্ধির সময়: দেখেছ—ওরা দুটি কেমন—

কেমন?

ঝগড়া করতে দেখেছ ওদের কোনদিন?

তুমি আমি না দেখলেই বুঝি ওরা ঝগড়া করে না?

কি সব হেঁয়ালি ক'রে কথা বলা মেয়েদের অভ্যাস, বললাম, অতশত বুঝি না, ঝগড়া করতে আমি কোন দিন ওদের দেখিনি।

সুলতা এক রকম মুখ ভেংচেই বললে, ঝগড়া করতে আমি কোন দিন ওদের দেখিনি—সব ঝগড়া লোকে দেখিয়ে করে না মশায়!……আমি 'বেট্' রেখে বলতে পারি, ঝগড়া ওরা নিশ্চয়ই করে, নইলে—

কি থামলে কেন, নইলে কি—বলোই না!

নইলে—সুদর্শনবাবুর মুখের রেখা অত কঠোর হ'ত না। আর, বউটিও হাসিখুসি হ'ত। তেমন ক'রে হাসতে দেখেছ ওকে কোন দিন?

বউটি যে হাসে না বললে সুলতা—এটা অবশ্য ওর হিংসার কথা। যে শরীর বউটির, আর যে খাটুনি খাটে, তাতে বেশি হাসবার সুযোগ নেই ওর; কিন্তু সুদর্শনবাবুর সম্বন্ধে সুলতার বিচার অনেকটা ঠিক: সুদর্শন

বাবুর চেহারা সুদর্শনই বটে ; তবুও তার মুখে চোখে যেন একটা কাঠিন্য আর অসন্তোষেরই ভাব। হায় সুদর্শন, এমন বউ পেয়েও যে তুমি খুশি হ'লে না জীবনে—তোমার দুর্ভাগ্য বই কি !

সুলতা কথাটা বলবার পরে আমি অনেক দিন থেকেই সুযোগ খুঁজছি ওদের ঝগড়া শুনবার : কবে কখন কি নিয়ে ওরা ঝগড়া করে ! বউটিকে ত এমন কিছু কোন দিন করতে দেখিনি—-যা নিয়ে ওদের ঝগড়া বেধে উঠতে পারে।

অনেক দিন অপেক্ষা করে থেকে থেকে ক্লান্ত হ'য়ে আমি অবশেষে ও আশা একেবারে ছেড়ে দিলাম : সুলতা মিথ্যাবাদিনী।

সাত দিনের মাঝে একখানা বই দিতে হবে,—পাবলিশারের তাড়ায় কয়েক দিন একটু রাত জেগে লেখা চলেছে। রাত দুটোর সময় লেখা থামিয়ে হাত মুখ ধুয়ে আলো নিভিয়ে শুয়েছি, —সবে ঘুমের ঝোঁক আসছিল—এমন সময় একটা হুঙ্কারে আমার তন্দ্রা কেটে গেল : সুদর্শনবাবু রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলছেন, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও ঘর থেকে, আমি বলছি বেরিয়ে যাও—

শুনেই উঠে বসলাম। পর মুহূর্তে একটি পরিচিত কণ্ঠের চাপা স্বরে শুনলাম : পায়ে পড়ি চেঁচিও না, পাড়ার লোক কি মনে করবে ?

তারপর চুপচাপ।

ঝগড়াটা ভাল করে শুনব বলে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। কিন্তু না, কোন পক্ষ থেকে আর দ্বিতীয় কথা শোনা গেল না। হতাশ হয়ে শেষে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন দেখলাম দুইজনের মুখই একটু ভারভার, আর কোন বৈলক্ষণ্য নেই। আগেকার দিনের রাত্রের ব্যাপারটা সুলতার কাছে বলতেই সে হেসে উঠল: এ ত জানা কথা !

কেমন ?

ন্যাকা, বোঝ না কিছু, না ?—দিনরাত খেটে খেটে অমন চেহারা করে তুলেছে, এখন—

—বলেই সুলতা পালিয়ে যাচ্ছিল, বললাম, এখন কি—সুলতা, বলে যাও।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে অদ্ভুত এক তিরস্কারের ভঙ্গিতে সুলতা—জানি নে, যাও—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আচ্ছা মুস্কিল, সব তাতেই এদের হেঁয়ালি : স্বামীর কাছে কথা খুলে বলতে—এত বাধে কিসের এদের বুঝি না।

কয়েকদিন পরের কথা।

সকাল বেলা ওদের কি করে কেটেছে—তা আর লক্ষ্য করি নি—লেখাটায় এমনি মন বসে গিয়েছিল। দশটার কাছাকাছি লেখাটা শেষ করে খবরের কাগজে চোখ বুলচ্ছিলাম, এমন সময় দেখি সুদর্শনবাবু স্নান করে খেতে এলেন। মুখখানা যেন অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি কঠোর। খেতে বসেই গ্লাসের অর্ধেক জল পাশের মেঝেই ঢেলে ফেললেন তিনি : এমন ভরতি করে জল দিলে গ্লাস তোলে কি করে শুনি? চেয়ে দেখি চোখ দুটি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তাঁর।

বউটি বাক্য ব্যয় না করে গ্লাসটিতে আবার কিছুটা জল ঢেলে দিল। ভাতের থালা এল সামনে। সঙ্গে সঙ্গে থালার অর্ধেক ভাত মাটিতে ফেলে চীৎকার করে উঠলেন সুদর্শনবাবু : হাজার দিন তোমায় বলেছি এত ভরতি করে ভাত দিও না, দরকার হয় চেয়ে নেব।—কেন, আর একবার ভাত দিতে হাত ব্যথা করে?

অবাক হয়ে চেয়ে রইল বউটি স্বামীর মুখের দিকে : কি অপরাধ করেছে সে!—স্বামী যাতে দুটি ভাত বেশি খান—এই জন্যই হয়ত এমনি করে দেয় সে!

পাতের এককোণে দুই টুকরো নেবু দেওয়া ছিল, ছুড়ে ফেলে দিলেন সুদর্শন : বীচি ছাড়িয়ে দিতে কি হয়?

নিতান্ত অপরাধিনীর মত নীরবে আর দুটি নেবুর টুকরো বীচি ছাড়িয়ে দিতে গেল সে স্বামীর পাতে, অমনি রা রা করে উঠলেন সুদর্শন বাবু : থাক, দিতে হবে না বলছি—

অপরাধ হয়ে গেছে—ক্ষমা চাচ্ছি আমি।

অপরাধ ?—তুমি আবার অপরাধ কর না কি ?

মুখখানা কেমন অসহায়ের মত করে স্বামীর মুখের দিকে চাইলে বউটি, কি করেছি আমি, কি করলে তুমি খুশি হও বল ত ?

অট্টহাস্য করে উঠলেন সুদর্শন : হায় হায়, আমায় খুশি করতে চাও তুমি ?

ছল ছল করে উঠল বউটির চোখ ! তবে কাকে খুশি করতে এত সব করি দিন রাত ?

সে তুমিই জান । স্বামীকে খুশি করতে হলে—

বলো, বলতে বলতে থামলে কেন—হয়েই যাক না আজ স্পষ্টাস্পষ্টি । আমাকে খুশি করতে কোন্ দিন কি করছে তুমি শুনি ?

তোমার সংসারের জন্য দিনরাত খেটে খেটে আমার কি চেহারা হয়েছে, দেখতে পাও না ?

দেখতে পাই, বুঝতে পারি না বলেই ত বলি এ আমার জন্যে নয়। স্বামীকে খুশি করতে শুধু খাটতে হয় না ।

তবে ?

মুখ ভেংচে বললেন সুদর্শন, তবে ? মেয়ে না তুমি—বোঝ না কিছু, না ?—স্বামীকে খুশি করতে মেয়েরা যা করে তার কোন কিছু একদিনও করেছ তুমি—বলো ?—একদিনও একটা ভাল কাপড় পরে সেজেছ, একটু ভাল করে চুল বেঁধেছ । খেটে খেটে শরীর ভেঙেছ—তাতে আমার কি, আমার জন্যে ত তোমার শরীর ভাঙবার কথা নয়, গড়বার কথা, স্বামীকে খুশি করতে মেয়েরা শরীর ভেঙে ফেলে না, গড়ে তোলে ।

সুলতা এদের ঝগড়া শুনে কোন ফাঁকে আমার পাশে জানালার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিল, সুদর্শনবাবুর শেষের কথাটি শুনে ফিক করে হেসে ফেলে জানলা ভেজিয়ে দিল । আমার দিকে সকোপ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, কি অসভ্য, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার কথা অমন নির্লজ্জের মত শুনতে আছে ?

জানালার একটুখানি যে ফাঁক ছিল—তা দিয়ে দেখলাম—ওরাও রান্নাঘরের দরজা ভেজিয়ে দিলে : বুঝতে পেরেছে ।

সুলতা দুষ্টু হাসি হেসে চলে যাচ্ছিল, আমি খপ করে তার হাত ধরে বললাম, যেও না, দাঁড়াও।

জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইল সুলতা।

তুমি ওদের ঝগড়া দেখে অমন হাসছে কেন বলত?

বাঃ—হাসি পেলে হাসব না!

তা হাসো—কিন্তু সুদর্শন বাবু অমন মিছেমিছি রাগ করছেন কেন বলত, কি সব কাণ্ড করেছেন দেখেছ?

সব দেখি নি, তবে বুঝেছি। মিছেমিছি নয়, কারণ আছে।

কি?

কাল রাতে আবার ওদের ঝগড়া হয়েছে।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম সুলতার দিকে।

যাও!—কি নেঁকা!—বলে কি এক রকম তিরস্কারের দৃষ্টি হেনে জোর করে হাত ছাড়িয়ে সুলতা সলজ্জ হাসিমুখে পালিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জিনিসটা সে যেন আমায় বুঝিয়ে দিয়ে গেল। সমস্ত কুয়াশা কেটে গেছে, সুদর্শনের মনের রূপ আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ঈর্ষার পরিবর্তে আমি আজ তার জন্য অনুকম্পা বোধ করছি।

সুলতার সকল ত্রুটি এখন আমি তুচ্ছ বোধ করছি: গেরস্থালির জন্য সে দিনরাত না খাটুক, আমায় সেবা না করুক, বেলা করে উঠুক, দুপুরে ঘুমাক, ঘুটিয়ে যাক, প্রসাধন করুক, নভেল পড়ুক, সিনেমা দেখুক—কি আসে যায়, সে আমার—

বাঁশী

বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। কেমনই যেন হয়ে গেল। মনের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। বাসটা আরও খানিকদূর এগিয়ে এসে থামল। বুকের মাঝে অনেক দিন আগের ভুলে যাওয়া একটা পুরানো বেদনা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল: একটা লোক বাঁশী বাজাচ্ছে। এবার স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তার সুর, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার মুখ আর চেহারা। সাতাশ আটাশ বড়জোর ত্রিশ বৎসর বয়সের এক যুবক, কপালে ছোট্ট একটা কাটার দাগ, কাঁধে ঝুলান একটা থলে ভরতি নানা সাইজের নানা রকমের বাঁশী। বিক্রী করতে এসেছে নিশ্চয়, কিন্তু বিক্রীর কথা তার মনেও নেই। আশে পাশে তার যেসব লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছে —তাদের মাঝে ক্রয়েচ্ছু লোক দু'চার জন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাদের দিকে সে ফিরেও তাকাচ্ছে না একবার, চক্ষু মুদ্রিত করে দেহের উর্ধ্বাঙ্গে ভাবের তরঙ্গ উৎক্ষেপ করে সে বাঁশী বাজিয়েই চলেছে।

বাঁশীওয়ালারা পথে কতই ত বাঁশী বাজিয়ে থাকে, কিন্তু কৈ মনটা ত ঠিক এমনি করে ওঠে না! চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বাঙালী, তাই বলে কি? না, তাও নয়: বংশীবদন কত বাঙালীরই ত বাঁশী শুনেছি, মনটাকে এমনি করে আচ্ছন্ন মূর্ছিতপ্রায় করে তুলতে পারে নি ত কেউ, তা ছাড়া শিল্পকে ছেড়ে প্রাদেশিকতাকে বড় করে দেখবার মত মন ত আমার নয়!

চক্ষু দুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসছিল—গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল, বুকের মাঝে কেমন যেন একটা বেদনা বোধ করছিলাম। এই সব অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই মন বিচার করে চলেছিল, কেন এমন হ'ল, এ কি? হঠাৎ মনে হ'ল, এই সুরটা—সুরটারই এই গুণ। ছেলেবেলায় একটু-আধটু সঙ্গীত-চর্চা করেছিলাম, বুঝতে কষ্ট হ'ল না লোকটা আশোয়ারী বাজাচ্ছে, হাঁ ঠিকই, আশোয়ারী নইলে মনকে এমনি উদাস করে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে আর কোন সুর পারে? কিন্তু আশোয়ারীও ত আরও কত শুনেছি—

কত বড় বড় ওস্তাদের মুখে, মনটা এতখানি অভিভূত হয়ে পড়ে নি ত কোনদিন।

আরও ভাল করে, বুঝতে চেষ্টা করলাম। হাঁ, আশোয়ারীর সঙ্গে আরও কি যেন মেশানো রয়েছে, ঠিক যে কি ধরতে পারছিলাম না, তবে আছে, তাতেই সুর বুঝি এত মধুর হয়ে উঠেছে। হয়ত এ ছাড়া আরও কিছু আছে: শিল্পীর দরদ, তার তন্ময়তা অথবা তার নিজের মনের গোপন কোন ব্যথা, হয়ত এও সব নয়, এ ছাড়া আরও কোন কিছু যার ঠিক সন্ধান পাচ্ছি না আমি।

বাস ষ্টার্ট দিলে। চলতে সুরু করলে বাস। নিজের বয়সকে শত ধিক্কার দিলাম মনে মনে: কৈশোর বা যৌবনের প্রথম দিক হলে এই ডবল ডেকারের উপর থেকে খটাখট শব্দ করে এক দৌড়ে নীচে নেমে গিয়ে বাঁশীওয়ালার পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম।

বাঁশীর সুর ক্রমে আমার শ্রবণের আয়ত্তের বাইরে হয়ে গেল, কিন্তু মনের মাঝে সে তখনও তরঙ্গ তুলছে। সেদিন রাত্রে কারও সঙ্গে একটি কথা বলতে পারি নি—অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমুতে পারি নি।

এরপর থেকে মহানগরীর পথে ট্রামে-বাসে যেতে বাঁশীর সুর কানে গেলেই লোকটাকে খুঁজি। সুর শোনার পর অবশ্য লোক খোঁজার প্রয়োজন থাকে না, কারণ মন জানে ও সুর শুধু একজনের বাঁশী থেকেই বেরুতে পারে। ভাগ্যচক্রে আর একদিনও বাসে আসতেই লোকটার দেখা মিলল। দূর থেকে বাঁশীর সুর কানে যেতেই বুঝতে পেরেছিলাম —এ সেই। বাঁশীতে বাজছিল সেদিন পুরিয়া, রাত্রি আটটার কাছাকাছি মেট্রোপলিটন ইনসিওরেন্সের নূতন কেনা বাড়ীটার সামনে। যাত্রীতে ডবল ডেকার ঠাসা, বেশিক্ষণ দাঁড়াল না বাস। তা ছাড়া প্রথম দিনের মত অতটা শিহরণও জাগে নি মনে। বাঁশীওয়ালা অতটা আত্মহারা হয়ে বাজাচ্ছে না সেদিন, বিক্রীর দিকে বেশ খানিকটা মন রাখতে হয়েছে তার। বেশ একটু রাগ হচ্ছিল লোকটার উপর, কিন্তু তখনই বিচারবুদ্ধি এসে মনকে ধমক দিলে: খেতে হবে না ওর—রোজগার না করে কেবলি তোমায় বাঁশী শোনাবে?

বাসে আসতে আসতে আমি বেশ উপলব্ধি করলাম—বাঁশী শুনে লোকটাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি, আরও বুঝলাম প্রেমের দ্বিতীয় স্পর্শ প্রথম স্পর্শের মত অত মারাত্মক নয় !

আবার এই নূতন ম্যাগনেটটিকে আরও দু'দিন পথে দেখলাম, বাঁশী বাজাতে নয়—বিক্রী করতে। বাজনা হয়ত একটু আগে শেষ হয়ে গেছে, সেটা সম্ভবত: ওর পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন। শিল্পীকে ব্যবসায়ীর মূর্তিতে কল্পনা করতে স্পর্শকাতর মন নারাজ হয়ে ওঠে, তবু লোকটির প্রতি আমার আকর্ষণ একেবারে যায় না।

একদিন রাত্রি দশটার কাছাকাছি—গড়িয়াহাটার মোড়ে বাস থেকে নামতেই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দূর থেকেই ওর বাঁশী শুনছিলাম। সেদিন বেহাগ বাজাচ্ছিল। বাস মোড়ে থামতেই ওর বাজনা থেমে গেল : কে একজন বাঁশীর দরদস্তুর করছে। শূন্যপ্রায় বাস থেকে নেমে আমিও যন্ত্র-চালিতের মত এগিয়ে গেলাম কাছে। ক্রেতাকে দরদস্তুর করতে দেখে ও মৃদু হেসে বললে, এক দামে বিক্রী ভাই, এই সময় কি দর-কষাকষি করবার ফুরসৎ পাবেন আপনারা ?

এই কথাগুলির মাঝে লোকটার শিক্ষা ও রুচির যেন বেশ খানিকটা পরিচয় পেলাম আমি। হাসিটাও বড় মধুর, দাঁতগুলিও সুবিন্যস্ত ঝকঝকে। এত কাছে পেয়ে কথা বলার আগে তার মুখে সর্বাঙ্গে একবার দ্রুত চোখ বুলাবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করতে পারছিলাম না। চেহারাটা এমন কিছু কন্দর্পের মত নয়—তবে সুন্দর। চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি, আর শিল্পপ্রতিভার জৌলুস। গায়ের রংটা হয়ত একদিন ফরসাই ছিল, কিন্তু এখন তামাটে। মাথার চুল ঘন এবং অনেক দিন কাঁচি পড়ে নি—তাই একটু দীর্ঘ, অবিন্যস্ত। এসব দিকে তার খেয়াল আছে বলেই মনে হয় না।

যে ছেলেটি বাঁশী দর করছিল সে পাঁচ সিকে দিয়ে একটা 'বি-ফ্লাট' কিনে নিয়ে চলে গেল। এর পরই আমার পালা। একটু লজ্জা করছিল। মনকে কষে ধমক দিলাম, অন্যান্য যন্ত্রের মত বাঁশীও একটি সুর-যন্ত্র, বেহালা তুমি বাজাও আর বাঁশীতেই এমন দোষ করলে !...আলো অবশ্য আমার

ধারণা ছিল বয়স কুড়ি পেরুলেই আর কারও বাঁশী বাজান উচিত নয়। ঐ বয়সের পর আমি নিজেও বাঁশী ছেড়েছি কিনা।

যাই হোক শিল্পের দোহাই দিয়ে মনে জোর এনে সঙ্কোচ কাটিয়ে কোন রকমে বলে বসলাম, "G" আছে ?

উদারা না মুদারা, বাবু ?

উদারা।

আজ ত উদারা আর নেই বাবু—দুটো ছিল বিক্রী হয়ে গেছে, বলেন ত কাল এনে দিতে পারি।

কত দাম ?

ভাল বাঁশের ভাল কিনিস করা মোটা 'জি' একটা দু' টাকা পড়বে, আর অর্ডিনারি সাত সিকে।

বেশ, ভালটাই আনবেন।

লোকটা কেমন একটু ম্লান সলজ্জ হাসি হেসে বললে, আমাকে আপনি বলছেন ?

বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন, আপনি বলব না কেন, না বলবার কারণ কি ?

লোকটা আর একটু বিষণ্ন হাসি হেসে বললে, বড় কেউ বলে না কিনা, তাই বলছি।

না বলবার ত কোন সঙ্গত কারণ নেই—চেহারা দেখে মনে হয় আপনি ভদ্রলোকের ছেলে।

লোকটি কোন উত্তর না দিয়ে মাটির দিকে তাকাল।

তা ছাড়া মনে হয় লেখাপড়াও কিছু করা হয়েছে—

বলেই একটু হকচকিয়ে গেলাম : আমার বাক্যবিন্যাসটা আপনি আর তুমির মাঝামাঝি হয়ে গেল। পরক্ষণেই ব্যাপারটা শুধরে নিতে বললাম, দেশ কোথায় আপনার—পূর্ববঙ্গে বোধ হয় ?

ম্লান হেসে লোকটি বললে, আজ্ঞে হাঁ।

আশে-পাশে তেমন লোক ছিল না, ক্রেতাও কেউ আসছিল না, সুতরাং আমার এই নূতন ম্যাগনেটের সঙ্গে পরিচয়ের এই সুযোগ। বললাম,

আপনাকে আমি আগেও লক্ষ্য করেছি, বাজনাও শুনেছি। বৌবাজারের ওদিকেও আপনি যান !

আজ্ঞে হাঁ, কলকাতার সর্বত্রই আমার যাতায়াত, সুবার্বেও মাঝে মাঝে যাই।

বুঝলাম অনুমান আমার মিথ্যা নয়—লোকটা লেখাপড়া সত্যিই জানে। বললাম, হাঁ, একদিন ডবল ডেকারে আসতে বৌবাজারের মোড়ে আপনাকে বাঁশী বাজাতে শুনেছি, আশোয়ারী বাজাচ্ছিলেন। বড় ভাল লেগেছিল আমার। এমন বাঁশী আমি—বলতে যাচ্ছিলাম 'জীবনে আর শুনি নি', কিন্তু সামলে নিয়ে বললাম, 'জীবনে কম শুনেছি'।

কথাটা শুনে দেখলাম গ্যাসের আবছা আলোতেও মুখটা তার একটু লাল হয়ে উঠল। যুক্ত করে চক্ষু দুটি অর্ধমুদ্রিত করে সে কাকে প্রণাম জানাল।

বুঝলাম না এ আমাকে, না তাঁর গুরুকে, না কোন দেবতার উদ্দেশ্যে—বললাম, বেশ শিখেছেন আপনি। এ কোন গুরুর কাছে শেখা—না শুধু নিজের চেষ্টাতেই ?

প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতা ক্রমে কেটে আসছিল লোকটির। বললে, এ আমার বাবার কাছে পাওয়া, বাবু। শিখেছি আমি অবশ্য নিজের চেষ্টাতেই, কিন্তু প্রেরণা পেয়েছি, উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি আমি এ বাবার কাছ থেকে। তিনি খুব গুণী লোক ছিলেন, প্রায় সব রকম যন্ত্র বাজাতে পারতেন, বাঁশী অবশ্য তিনি বাজাতেন না, বাজাতেন সব তারের যন্ত্র—রাগ-রাগিণী সবই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। বাঁশী বাজানো আর বানানো অবশ্য আমি নিজের চেষ্টাতেই শিখেছি—

এই সময় একজন খরিদ্দার এসে দরদস্তুর করে কয়েক মিনিট সময় আমাদের নষ্ট করে দিয়ে গেল,—কারণ বাঁশী সে কিনলে না। বাঁশী না কিনে শুধু শুধু কথা বললে যদি ব্যাপারীর সময় নষ্ট করা হয়,—তবে আমার বেলায়ও ত এ সত্য !—মনে হতেই একটা ভি-বাঁশী বের করতে বললাম লোকটিকে।

দাম কত ?

পকেট থেকে টাকাটা বের করে তার হাতে দিয়ে বললাম, বাঁশীটায় একবার এক কলি বাজায়ে দিন আপনি, আওয়াজটা একবার দেখে নি।

কথাটা বলা হয়ত আমার ঠিক হয় নি। লোকটি মৃদু হেসে বাঁশীটা একবার মুখে তুলে নিলে। পরক্ষণেই মনে হ'ল—আকাশ থেকে আমার কানে যেন এক পশলা সুধাবৃষ্টি হয়ে গেল।

বেশি শুনতে চাওয়া উচিতও নয়, তার সুযোগও মিলল না। আর একটা ডবলডেকার এসে গেল, তা থেকে যাত্রী নামল এবং দুটি তরুণ এসে বাঁশীর দরদস্তুর সুরু করলে। নিজের বাঁশীটি হাতে নিয়ে, পরের দিন মোটা জি-বাঁশী আনবার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি সেদিনকার মত লোকটির কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

পরের দিন সন্ধ্যায় লোকটির কাছ থেকে মোটা 'জি' কেনবার সময় তার নামটি জেনে নিয়েছিলাম। পুরো নামটা অবশ্য প্রথমে সে আমায় বলতে চায় নি। প্রথমে বললে, বি, গুহ।

হেসে বললাম, এ ত ঠিক এ দেশের দস্তুর হ'ল না—বংশের নামের চেয়ে বাপমায়ের দেওয়া নামটারই এখানে কদর বেশী।

সামান্য একটু সঙ্কোচ—তার পরেই সলজ্জ হাসি হেসে বললে, ভৈরব গুহ।

নামটা একটু সেকেলে ভেবে হয়ত লোকটি সঙ্কোচ বোধ করেছিল, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল অন্য কথা। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার জন্ম হয়েছিল বুঝি প্রভাতে?

হাঁ, কি করে জানলেন?

আর নাম রেখেছিলেন বুঝি আপনার বাবা?

লোকটি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, হাঁ, কিন্তু সব আপনি ঠিক ঠিক বলছেন কি করে বুঝছি না ত।

সেকথার জবাব না দিয়ে বললাম, বড় সুন্দর নাম রাখা হয়েছে আপনার, নামদাতার শিল্পজ্ঞান আর রুচির প্রশংসা করতে হয়।

কথাটা শুনে লোকটি তেমন খুশি হয়েছে বলে মনে হ'ল না ; জ্র-দুটি তার ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠল, বললে, কেন বলুন ত ?

বললাম, আপনি এত সঙ্গীতচর্চা করেছেন আর এটা বুঝলেন না ? ভৈরব হচ্ছে প্রভাতের একটা রাগের নাম, অন্য কথায় যাকে বলে ভায়রো, প্রভাতের বন্দনার সুর—বিশ্বদেবতার বন্দনা, বড় দিব্য গম্ভীর এর রূপ ।

এক মুহূর্তে লোকটির মুখের বিরক্তি আর অস্বস্তির রেখাগুলি নিঃশেষে মুছে গেল, বললে, তাই ত, এতদিন ত কথাটা ভেবে দেখি নি ।

কয়েকটি নূতন ক্রেতা এসে দাঁড়িয়েছিল, আর বিশেষ কথা সেদিন হতে পারল না ; কথার প্রয়োজনও আমার তেমন নয়, প্রয়োজন আমার ওর বাঁশী শোনা, আর সে-ও যে সে রাগ-রাগিণী নয়—সেদিনকার মত সেই আশোয়ারী—কিন্তু সে ত ফরমাস দিয়ে যেখানে 'যেখানে হতে পারে না, লোকটির সঙ্গে ভাব রেখে একদিন তাই শোনার সম্ভাবনাটুকু শুধু বড় করে রাখতে চাই ।

আর এই সম্ভাবনাই আর একদিন আমার জীবনের কেমন আশ্চর্য রকমে সফল হয়েছিল সেই কথাই আজ বলব ।

ভৈরবের সঙ্গে আরও দু-এক বার আমার অবশ্য দেখা হয়েছে, তার কাছ থেকে আমি আরও দুটো বাঁশী কিনেছি, আমার পরিচয়ও সে কিছু কিছু পেয়েছে, কিন্তু কোথায় থাকে সে, সে খবর আর আমি রাখি নি ।

বিজয়ার দু'দিন পর একটা কলোনীতে গিয়েছিলাম প্রণাম করতে আর প্রীতি জানাতে । সেখানে আমাদের কয়েকজন আত্মীয় আস্তানা গেড়ে বাস করছেন । আত্মীয়বাড়ীতে বৈকালিক জলযোগ সেরে এদিক-ওদিক একটু ঘুরে দেখছিলাম । এসব জায়গায় ঘুরতে আমার বেশ লাগে । বাইরের সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে কেবল আত্মশক্তি মাত্র সম্বল নিয়ে মানুষ নিজেকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করতে যে আয়োজন করছে তা দেখে সত্যিই আনন্দ লাগে । অথবা নাগরিক কৃত্রিমতার খোলস-খসা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিচিত্র রূপের এক অপূর্ব সমাবেশ এখানে দেখতে পাই ।

কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরার পর বাস-ষ্টপের সামনে এক চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লাম । বাস আসতে একটু দেরী আছে—তা ছাড়া সন্ধ্যার

দিকে বাসে ভিড়ও থাকে খুব। একটু দেরী করেই যাব ঠিক করেছিলাম। আসল কথা এখানে এই চায়ের দোকানে বসে লোকের কথা শুনতেও আমার বেশ ভাল লাগে। সুতরাং পেয়ালার পর পেয়ালা করে অন্ততঃ তিন চার কাপ চা আমার এখানে অনায়াসে চলতে পারে।

দোকানে বসে সবে প্রথম পেয়ালায় চুমুক দিয়েছি এমন সময় 'ও নরেন্দর'—বলে ঘরে ঢুকল কে। কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত। চেয়ে দেখি ভৈরব। মুখ থেকে অমনি বেরিয়ে গেল—আরে আপনি!

ভৈরব আমার দিকে চাইতেই খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকেও বেরুল—বাবু, এখানে।

ভৈরবের মুখে বাবু কথাটা অবশ্য আমার তেমন ভাল লাগল না। তার সঙ্গে যত পার্থক্য আমি রাখতে চাই, অথবা আমার বিচারমতে যতটা পার্থক্য হওয়া উচিত, বাবু কথাটা যেন সে সব ওলটপালট করে দেয়। তবু তখনকার মত কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে বললাম, হাঁ আমার কয়েকজন আত্মীয় থাকেন এখানে, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম—বিজয়ার পর—

ভৈরব মিনতির সুরে বললে, তা বাবু আমার ওখানেও একটু পায়ের ধুলো দিতে হচ্ছে যে, আপনি এসে দোকানে—

বললাম, তা কি হয়েছে—এখানে আমার বড় ভাল লাগে।...আপনার বাড়ীও এখানে বুঝি? ভৈরব হাসল: বাড়ী আর কি করে বলি, বাবু, একটু মাথা গুঁজবার স্থান করে নিয়েছি।

দোকানের মাঝে আর প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছিলাম না ভৈরবের সঙ্গে। চায়ের দাম মিটিয়ে বাইরে আসতেই ভৈরব আমায় চেপে ধরল, চলুন বাবু—কাছেই আমার বাড়ী—পেয়েছি যখন আপনাকে, কিছুতেই ছাড়ছি না।

ভৈরবের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হচ্ছিলাম আমি, কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলাম না—এমন কি পেয়েছে সে আমার কাছ থেকে যাতে সে আমার এমন ভক্ত হয়ে উঠতে পারে। যাই হোক—ভৈরবের আহ্বানে 'না' করতে পারলাম না, তা ছাড়া মনে মনে কৌতূহলও হয়ত ছিল—বাড়ীতে কি জীবন সে যাপন করে তা দেখতে।

গড়িয়াহাটা মে'ন রোড ছেড়ে গলিতে ঢুকে ভৈরব আর একবার বাবু বলতেই আমি ধমক দিয়ে উঠলাম—দেখুন ভৈরববাবু, আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া জানেন। আমাকে এমনি বাবু, বাবু—করা আমি পছন্দ করি না। আমার পরিচয়ও আপনি পেয়েছেন, তেমন কিছু হোমরা-চোমরা আমি নই। দরকার হলে আমাকে কল্যাণবাবু ডাকতে পারেন, আর যদি বেশি আপনার বলে মনে করতে পারেন—তা হলে দাদা বলতে বাধা দেখি না।

বেশ, তা হলে আমাকেও আপনি বলবেন না আপনি, শুধু ভৈরব বলে ডাকবেন—আমি ত আপনার কত ছোট।

আচ্ছা, তাই হবে।

মনটা খুশি হয়েই উঠল: ভৈরবের সঙ্গে এই রকম অন্তরঙ্গতাই চাইছিলাম আমি। একটু পরেই মনটা আমার আবার হঠাৎ খিচড়ে গেল—যখন কানে এল ভৈরব ডাকছে—দাদু, ডাইনে—এইবার এইদিকে ফিরতে হবে আমাদের।

মনের উষ্মা আর চেপে রাখতে পারলাম না—বললাম, দেখ ভৈরব, এই দাদু, দাদুটা বিশ্রী লাগে আমার কানে, তুমি আমায় কল্যাণ-দা—অথবা শুধু দাদা বলে ডাকলে খুশি হব।

ভৈরব আমার উপর রাগ করলে কিনা কে জানে। কথা বললে সে একেবারে বাড়ীর সামনে এসে: এসে গেছি, দাদা, আপনি এক সেকেণ্ড দাঁড়ান—দেখে আসি আমি কি অবস্থায় আছে।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হ'ল না আমার—প্রায় পরক্ষণেই ফিরে এসে কেমন একটু হেসে বললে, আসুন দাদা, আসুন—

হাসছ যে।

আর বলবেন না, কাপড়টা পালটাতে বলছিলাম, তা ও কিছুতেই শুনলে না, বলে—যেমন আছি তেমনি থাকব—কাপড় পালটানো ত আর্টিফিসিয়ালিটি—

আমিও হাসতে হাসতে ওদের ঘরে ঢুকলাম। ঢুকেই যাকে দেখলাম তাকে দেখেই কারো বুঝতে অসুবিধা হয় না—ভৈরব এরই মুখের কথাটা

হুবহু আবৃত্তি করে শুনিয়েছে আমায়, অর্থাৎ ইংরেজী শব্দটিও এরই উচ্চারিত। দেখেই মনে হ'ল আধ ময়লা কাপড় পরে দেবী সরস্বতী দাঁড়িয়েছেন আমার চোখের সামনে।

মুখে মধুর স্মিত হাসি। হাত জোড় করেই নমস্কার করলে মেয়েটি। প্রতিনমস্কার করলাম। ভৈরবের সঙ্গে তুমি বলে কথা বলতে সুরু করেছি, কিন্তু বয়সে এত ছোট হলেও রীতিমত ভাবতে হয় এর সঙ্গে কথা বলতে মধ্যম পুরুষের কোন্ শব্দটি ব্যবহার করা উচিত—শিক্ষা এবং রুচির এমন একটা দীপ্তি রয়েছে এর মুখে।

ভৈরবের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললাম, ভৈরব, আমার এ ছোট্ট বোনটির নাম কি ?

মেয়েটি হাসল। বড় মধুর সে হাসি। সে-ই জবাব দিলে, আমার নাম শান্তি।

শান্তিই বটে—মনে মনে ভাবলাম আমি : চারদিকে তখন দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছি আমি। রাণীগঞ্জের টালি ছাওয়া বাঁশের বেড়া দেওয়া ছোট ঘরখানির এক পাশে এক তক্তপোষে নাতিশুভ্র একটা বিছানা পাতা, তারই নীচে একটা জলচৌকীতে সোনার মত করে মাজা থালা ঘটি বাটি গেলাস, ঝক্‌ঝকে পেয়ালা ডিশ। বেড়ার গায়ে ছাদ থেকে ঝুলান একটা বাঁশের আলনায় আধময়লা ও ফরসা কয়েকটা জামা কাপড় সাড়ী ব্লাউজ সাজা। যেদিকে তক্তপোষ তার উল্টো দিকে একটা ছোট বেঞ্চে ঢাকনা দেওয়া একটা হারমোনিয়ামের বাক্স ও একটা ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের উপরে একটা টাইমপীস ; আর ওদিককার দেয়ালে ঢাকনা দেওয়া একটা সেতার ঝুলানো। ওদিকে নজর পড়তেই বলে বসলাম, বউমা বাজান বুঝি ?

শান্তি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, এই যে একটু আগে বললেন, আমার বোন,—বলে মৃদু হাসল।

বোন আর বউমাতে তফাৎ কি আছে ?

তা আছে বই কি—বউমা বললে ওঁর সম্পর্কটাই বড় হয়ে ওঠে, আমি হয়ে যাই ছোট।

তু—

—বলে হো হো করে হেসে উঠলাম আমি : হার মানলাম দিদি !

শান্তি বললে, আর একটা ভুল করলেন দাদা, আমার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'বাজান' বলা আপনার উচিত হয় নি, বলা উচিত ছিল, বাজায় ; বোনের সঙ্গে আপনি আপনি করে কেউ কথা বলে না।

শুনে মনটা যেমন জুড়িয়ে গেল, বিস্ময়বোধ করলাম ততোধিক। হেসে বললাম, হার মানতে হ'ল, বোনটি !

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভৈরব হাসতে হাসতে বললে, হার মানতেই হবে আপনাকে, উনি যে সরস্বতীর মানসকন্যা, যুক্তিতে পেরে উঠবেন না ওর সঙ্গে, আমাকে কথায় কথায়—

ভ্রূ কুঁচকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে শান্তি শাসন করলে ভৈরবকে, তার পর আমার দিকে চেয়ে বিছানা দেখিয়ে বললে, বসুন, দাদা আপনি, আমি একটু চায়ের জল চাপিয়ে আসি।

ভৈরব অমনি টিপ্পনি কাটলে, দাদা, দাদা ত করছ, কিন্তু এদিকে যে হাত জোড় করে নমস্কার করলে দাদাকে, বিজয়ার পরে একটা—

শান্তি অমনি লজ্জা পেয়ে ছুটে এসে পায়ের কাছে এক সভক্তি প্রণাম করে গেল।

শান্তি বারান্দায় চায়ের জল গরম করতে গেল, আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, শান্তি গান বাজনা দুই-ই জানে বুঝি ?

ভৈরবের চোখ মুখে যেন একটু লাল আভা দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল, বললে, গান বাজনা মোটামুটি এক রকম সবই জানে, তবে সবচেয়ে বড় কথা, সুরের একেবারে পাগল। একটা ভাল সুর শুনলে একেবারে কাঁদতে বসে যাবে।

বারান্দা থেকে ঝঙ্কার এল, দেখ, ভাল হবে না বলছি—

ভৈরব মৃদু হেসে উত্তর দিলে, না না, ও সব আর বলছি না আমি ! তার পর আমার দিকে চেয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে, ওর পরিচয় শুধু ঐটুকু নয়, লেখাপড়া ওর কাছে বসে দশ বৎসর আমি শিখতে পারি : ও গ্র্যাজুয়েট আর আমি আই-এ অবধি পড়েছি—

শান্তি এবার জ্বলন্ত একখানা কাঠ নিয়ে উঠে এল, দেখুন ত দাদা !

আমি হেসে উঠলাম, না না, শান্তি তুমি ফিরে যাও, আমি ওকে শাসন করে দিচ্ছি : একজন গ্র্যাজুয়েট কখনও একজন আই-এ পড়া ছেলেকে দশ বৎসর পড়াতে পারে, যত সব ইয়ে—

'আপনিও ওর পক্ষ নিলেন'—বলে অভিমানের কান্নার সুর নিয়ে শান্তি বারান্দায় ফিরে গেল।

আমি হাসতে হাসতে তাকে সান্ত্বনা দিতে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। দেখি শান্তি হেঁট মুখে উনুনের ধারে বসে সত্যিই কাঁদছে।

বিস্ময়ে আমি ওকে সান্ত্বনা দিতে ভুলে গেলাম, আমার কেবলই মনে হতে লাগল, আমি আজ যেন এক স্বপ্নলোকে এসে গেছি, অথবা সত্যিই স্বপ্ন দেখছি।

কয়েক সেকেণ্ড পর আমি আমার পূর্ণসম্বিৎ ফিরে পেলাম : ওকে সান্ত্বনা দিবার ত কিছু নেই, ও ত এ দুঃখের কান্না কাঁদছে না। ওর কান্নার মূল কারণ ঘন রহস্যে আবৃত।

এই বার ওর উনুনের দিকে নজর পড়ল। জ্বাল দিচ্ছে ও পাহাড়ে তরল বাঁশের কুচি দিয়ে, যে বাঁশ দিয়ে ভৈরব তার বাঁশী তৈরি করে। বারান্দার অপর পাশে পাঁচ-ছয় হাত লাঠির মত লম্বা ঐ বাঁশেরই বোঝা বাঁধা রয়েছে।

শান্তির এ কান্নায় আমার কিছু করবার নেই বুঝে আমি বেকুবের মত আবার ঘরে ফিরে এসে বসলাম। ভৈরবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আজ আর বেরোও নি—না?

না। লক্ষ্মীপুজোর আগে আর বেরুব না। এ সময়টা আমাদের দেশে আত্মীয়স্বজনেরা সব দেখাশুনো করতে আসেন—নিজেদেরও যেতে হয়।

হেসে বললাম, জানি, আমিও ত তোমাদেরই মত ও অঞ্চলেরই লোক।

কোথায় বাড়ী ছিল আপনার?

যশোর।....শান্তির পিতৃকুলের বাস ছিল কোথায়?

ভৈরব একটু গম্ভীর হয়ে উঠল যেন : ওঁরা এইখানেরই লোক।

শান্তি বারান্দা থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, না, দাদা না, আমাদেরও আদি নিবাস ছিল ফরিদপুরে।

ফরিদপুরে, কোথায় ?

মাদারীপুর সাবডিভিশানের রতনডাঙ্গা।

রতনডাঙ্গা। রতনডাঙ্গায় ত আমার মাতুলালয়। রতনডাঙ্গার কারা বল ত ?

শান্তি বারান্দা থেকেই উত্তর দিলে, রতনডাঙ্গার সনাতন বাঁড়ুজ্জে ছিলেন আমার প্রপিতামহ—

বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে : সনাতন বাঁড়ুজ্জে। বাঁড়ুজ্জে, আর এ দিকে হচ্ছে গুহ—ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ !

নিজেকে সামলে নিয়ে শান্তির কথার জবাবে বললাম—হাঁ, সনাতন বাঁড়ুজ্জের নাম শুনেছি বই কি—তিনি ত ওখানকার ডাকসাইটে জমিদার ছিলেন। পরক্ষণেই একটু কৌতুকের লোভ সংবরণ করতে না পেরে ভৈরবকে বললাম, তোমাদের তা হলে দেখছি এ 'লাভ ম্যারেজ', সবই 'আর্টিষ্টিক্' তোমাদের—বলেই একটু উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলাম। ভৈরব কেমন গম্ভীর হয়ে রইল, কোন জবাব দিল না।

আমিও এর পর—কি বলতে কি বলে বসব—ভেবে কিছুক্ষণ চুপ করেই রইলাম। শান্তি পেয়ালা নিতে ঘরে এল। নিজে হাতে তৈরি খাবার বের করলে। একটু পরে একখানা থালার উপর দু' কাপ চা আর এক প্লেট খাবার নিয়ে ঘরে এল। এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর এবার আবার কথা বলবার সুযোগ পেলাম আমি। খাবারের দিকে দৃষ্টি দিয়ে শান্তিকে বললাম, এ সব তৈরি করতে জান তুমি ?

মৃদু হাসল শান্তি : কিছু জানতাম, বাকী শিখে নিয়েছি।

প্রথম দিন এসেই এদের অনেক কিছু জেনে নিয়েছি বলে বোধ হয় একটা অপরাধের ভাব মনে চেপে বসেছিল। আলাপ বেশ সহজ হয়ে উঠছিল না, তবু জোর করে শান্তিকে বললাম, আজ রাত হয়ে যাচ্ছে, আর বিরক্ত করতে চাই না, এর পর যেদিন আসব গান বাজনা শোনাতে হবে কিন্তু।

শান্তির মুখ থেকে ছেলেমানুষির ভাব কেটে গিয়ে আবার সেই প্রথম দেখা বুদ্ধির দীপ্তি আর গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে। কোন রকম ন্যাকামি না

করে শান্ত কণ্ঠেই সে উত্তর দিলে, আসবেন, যেটুকু পারি শুনতে চাইলে শোনাব বই কি, শুনতে চাইলে যাদের গুমোর বেড়ে যায় আমি তাদের দলে নই।—বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার ভৈরবের দিকে চাইলে।

ভৈরব অমনি কৃত্রিম রোষ দেখিয়ে বললে, মিছে অপবাদ কেন, শোনাই নে আমি তোমায় বাঁশী ?

তা বটে !

অভিমানে কে যেন খট্ করে দরজা বন্ধ করে দিলে।

সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছিল। আর দেরী করলে বাস পাব না। শেষ বাসখানা ৯-৪৫এ আসে। সুতরাং উঠতে হ'ল। হ্যারিকেন ধরে শান্তি আমায় এগিয়ে দিতে এসে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই বললে, আবার আসবেন দাদা—রবিবার সন্ধ্যার পর উনি বাড়ী থাকেন।

গান শোনাতে হবে কিন্তু।

—বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। শান্তি ;ওখান থেকেই বললে, শোনাব—আপনার লেখা বই দিতে হবে কিন্তু আমায়, নইলে আড়ি—

কণ্ঠস্বরে আবার সেই বালিকার সারল্য ফিরে এসেছে। যেতে যেতেই হেসে উঠলাম : আচ্ছা, আচ্ছা সে হবে'খন। মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল, আমার সম্বন্ধেও কিছু কিছু শুনেছে তা হলে ভৈরবের কাছ থেকে। নিজেও খোঁজ-খবর রাখে নিশ্চয়, লেখাপড়া ত জানে !

ভৈরব আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল—এগিয়ে দিতে এসেছিল। বাসে উঠবার আগে তাকে বলে এলাম, সামনের রবিবারে নয়, এর পরের রবিবারে আবার আসব।....বড় আনন্দে কাটল তোমাদের এখানে।

ভৈরব প্রত্যুত্তরে বললে, আমাদেরও যে কত আনন্দ হ'ল এখন বোঝাতে পারব না, পরে এলে বুঝবেন। আসবেন দাদা—

আসব—

বাস ছেড়ে দিলে। এদের এখানে যা দেখে গেলাম—সে রাত্রে তারই স্মৃতি আমায় একটা গানের সুরের মত অভিভূত করে রেখেছিল।

নির্দিষ্ট রবিবারে ওদের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে নিজের লেখা দুখানা বই দিয়ে এসেছি—শান্তির গান বাজনা শুনে এসেছি। ভৈরবকে বাঁশী

বাজাতে বললাম, সে কিছুতেই রাজী হ'ল না : 'মুড' নেই দাদা।— শান্তির গানের সঙ্গে অবশ্য সে বাঁশী ধরেছিল, কিন্তু তাতে ঠিক ভৈরব গুহের সেই বাঁশীর সুর আসে না।

কবে তার 'মুড' আসবে সেই আশায় প্রায় প্রতি রবিবারেই ওদের ওখানে যাওয়া সুরু করলাম। তা ছাড়া ওদের দুজনকেই আমি দস্তুরমত ভালবেসে ফেলেছিলাম। তাদের এই অদ্ভুত রহস্যময় জীবনও আমার কাছে কম আকর্ষণের ছিল না। যত দিন যাচ্ছিল ততই যেন আরও বেশি রহস্যময় হয়ে উঠছিল।

এদের জীবনের অনেক কথাই আমি ধীরে ধীরে জেনে নিয়েছি। এদের বিয়েটা যে অসবর্ণ সেকথা অবশ্য আমি প্রথম দিনই বুঝে গিয়েছিলাম, কিন্তু শান্তির দিক দিয়ে সে যে কি দুঃসাহসিক সাধনার সিদ্ধি ভাবলে অবাক হতে হয়। আমারই মত সেও ভৈরবের বাঁশী শুনেই প্রথম আকৃষ্ট হয়— আকৃষ্ট হয় বললে হয়ত কিছুই বলা হয় না— সে একেবারে পাগল হয়ে যায়। প্রথম দিন ভৈরবের বাঁশী শুনে ড্রাইভারকে বলে' সে মোটর থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। সে রাত্রে নাকি ঘুমুতে পারে নি। পরে—সন্ধ্যার পরে বেড়াবার ছলে মোটর নিয়ে সে পথে পথে ভৈরবের বাঁশী শুনবার জন্যে ঘুরে বেড়াত—কোন দিন ভাগ্যে বাঁশী শোনা জুটত, কোন দিন বাঁশী বিক্রয়-রত ভৈরবকে সে দূর থেকে দেখেই ফিরে যেত।

বড় একটা ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শান্তির বাবা প্রায়ই বাইরে বাইরে থাকতেন। শান্তি আর ভৈরবের মধ্যে কি করে যে আলাপ পরিচয় এবং পত্র বিনিময় সুরু হ'ল সে অনেক কথা। ঘনিষ্ঠতা হবার পর প্রায় প্রতিদিনই দীর্ঘ পত্র লেখার পালা চলে। ভৈরব জানিয়েছিল তার দৈন্যের কথা, শান্তি তার উত্তরে বলেছিল, ওসব কোনো কিছুর দরকার নেই···শান্তি একদিন ভৈরবকে সিভিল ম্যারেজ য়্যাক্ট অনুসারে বিয়ে করে বসল।

বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর মিঃ ব্যানার্জি প্রবাসে শান্তির চিঠি পেলেন —বাবা, ভালবেসে আমি এক সুর-সাধককে বিয়ে করেছি। রাগ করো না—আশীর্বাদ করো আমরা যেন সুখী হই।

মিঃ ব্যানার্জি পাকা লোক। অন্তরে জলে গেলেও বাইরে বিরূপ ভাব দেখান নি তিনি। জামাইকে নিজের কার্মে চাকরি দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, কি কারণে বুঝলাম না তাঁর সে চেষ্টা সফল হয় নি। ব্যাপারটা খানিকটা রহস্যের মতই রয়ে গিয়েছিল আমার কাছে। আর আশ্চর্য হবারই বা কি আছে, এদের সব কিছুই রহস্যময়।

ওদের জীবনের কোন কথাই জোর করে জানতে চেষ্টা করি নি আমি। একদিন হঠাৎ কেন জানি না, সেই দুর্মতি হয়ে গেল। সে রবিবারে কলোনীতে আমার সাবেক আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করে একটু সকাল সকাল এসে গিয়েছিলাম ওদের ওখানে। ভৈরব সবে মাত্র বাড়ী ফিরল আর শান্তি বেরিয়েছে বাজার করতে। ওদের দু'জনের কাছেই ঘরে ঢুকবার আলাদা চাবি থাকে।

ভৈরব আমার জন্যে নিজেই চা তৈরি করে নিয়ে এল। চৌরঙ্গী থেকে কিছু কাজু বাদাম কিনে এনেছিল ভৈরব; শান্তি না কি এ খেতে বড় ভালবাসে।

বাদাম সহযোগে চা খেতে খেতে হঠাৎ বলে বসলাম, শান্তি তা হলে কাজু বাদামের কথা ভুলতে পারে নি?

ভৈরব হেসে উঠল: না।

সুযোগ পেয়ে বললাম, আচ্ছা, ভাই, একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবি, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠি না।

ভৈরব জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল।

কথাটা হচ্ছে···মানে দেখতে পাচ্ছি শান্তি তার পূর্বজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আস্বাদ একেবারে ভুলতে পারে নি, অথচ এ সব ভোগ করবার সুযোগও তার ছিল। তোমার শ্বশুর না কি তাঁরই কার্মে তোমায় চাকরি দিতে চেয়েছিলেন, সেটা নিলে ত আর—

ভৈরব আমার মুখের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, কি করব, দাদা, ও কিছুতেই রাজী হল না, বলে তা হলে আমি তোমাকে হারাব, সে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। আপিসের বাবু বা বড় ব্যবসায়ীকে বিয়ে করতে চাইলে ত আমি অনায়াসেই করতে পারতাম।

সে ত আমার স্বপ্ন নয়। যে রূপে তুমি আমায় দেখা দিয়েছ—সেই রূপকেই আমি চিরদিন আমার জীবনের ধ্রুবতারা করে রাখতে চাই। তোমায় অন্য মূর্তিতে কল্পনা করতে গেলেই আমি মারা যাব।

অবাক হয়ে গেলাম আমি ভৈরবের কথা শুনে। বললাম, তাকে বললে না কেন, এ যে অভাবের জীবন, এ যে দারিদ্র্যের জীবন!

ম্লান হেসে ভৈরব বললে, সে সব বলতে কি কিছু বাদ রেখেছি দাদা!

কি বলে ও?

ও বলে, তাতে দুঃখ কি, এ জীবন ত আমার স্বেচ্ছাবৃত। ওর ধারণা আমি অন্য কিছু করলেই ওর স্বপ্ন ভেঙে যাবে, আমি আর ওকে তেমনি করে বাঁশী শোনাতে পারব না।

কিন্তু এ জীবনেও ওকে ঠিকমত বাঁশী শোনাতে পার কি, যা ক্লান্ত হয়ে আস—

আবার ম্লান হাসি দেখা দিল ভৈরবের মুখে: পারি কি না জানি না তবে চেষ্টা করি।

কবে, কখন?

মাসে একবার, পুর্ণিমার রাত্রিতে—রবিবার সন্ধ্যায় ছাড়া পুর্ণিমার রাত্রেও আমি ঘরের বার হই না, সেইদিন আমি ওকে বাঁশী শোনাই, ও আমাকে—

বলতে গিয়ে থেমে গেল ভৈরব।

থামলে কেন, বল, বল—

আপনি দাদা, তবু আপনার কাছে আমাদের গোপন কিছুই নেই: সেইদিন ও আমাকে নিঃশেষে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে ভালবাসে, আর ঊনত্রিশ দিন ও আমার শুধু অতিপ্রিয় বন্ধু, সাথী—

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে শুধু ওর মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। তার পর এক সময় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললাম, ভাই ভৈরব, একদিন আমি তোমার বাঁশী শুনেই তোমার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম—বহুদিন আমি তোমার সে রকম বাঁশী শুনি নি—একদিন পুর্ণিমার রাতে শান্তির মত আমাকেও শ্রোতা করবে তোমার বাঁশীর?

হাসল ভৈরব : আপনার কোন অনুরোধে কি আমি 'না' বলতে পারি।

কি, কি অনুরোধ হচ্ছে দাদার ? বলতে বলতে ঘরে ঢুকল শান্তি। সহসা আমার কৌতুকবোধ জেগে উঠল—বললাম, বলো না ওকে ভৈরব, হঠাৎ আমরা ওকে একেবারে চমক লাগিয়ে দেব।

এর দিন পাঁচেক পরেই এক পুর্ণিমা পাওয়া গেল। মাঘের পুর্ণিমা। সন্ধ্যার একটু পরেই আমি ওদের ওখানে গিয়ে হাজির হলাম। রাত্রির রান্না শান্তি আগেই সেরে রেখেছিল। আমি গেলে শুধু আর একবার চা করলে।

সবাই যেন কেমন গম্ভীর। আমি নিজেও তেমন বেশি কথা বলতে পারছিলাম না। বহুপ্রত্যাশিত দিনের আকাঙ্ক্ষায় যেন মনে নেশা ঘনিয়ে আসছিল।

বাইরে সেদিন—'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।' আমাদের প্ল্যান ছিল—এই মধুর, ভরা জোছনায় রেল লাইনের পাশে উন্মুক্ত প্রান্তরে বসে বাঁশী শুনব, কিন্তু বিদায় নেবার আগে শীতটা সেদিন আবার একটু জেঁকে পড়েছিল, তাই প্ল্যানটা আমাদের পালটে দিতে হ'ল।

গরম কাপড়ের শার্টের উপর একটা জাম্পার এঁটে ভৈরব খাটের এক পাশে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসল, আমরা বসলাম তার অপর পাশে দুই কোণে। কথা বলছে না কেউ। ভৈরব চক্ষু দুটি মুদ্রিত করে বসেছে……ধীরে ধীরে এবার সে বাঁশীটি তুলে নিলে মুখে। আমার পুরানো বুকটা স্পন্দিত হতে চায় যেন—শান্তির দিকে চেয়ে দেখলাম একবার : সে হাত দুটি কোলের উপর তুলে নিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসেছে—

ঘরের সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সহসা বাঁশী বেজে উঠল। প্রথমে অনেক টানা টানা কেমন যেন এক কান্নার মত....না, না—কান্না বললে ঠিক হবে না, কেমন যেন মন উদাস করা, তাও নয়—কেমন যেন এক গভীর অনুতাপের সুর। ধীরে ধীরে সুর জলদে অগ্রসর হতে থাকলে বোঝা গেল পুরবী বাজছে···

সারা দিনটা কেটে গেল—করবার মত কাজ কিছু করা হ'ল না, সূর্য উদিত হয়ে দিব্য আলো বিকীরণ করে তাপ দিয়ে আঁধার-সমুদ্রে মিলিয়ে

গেল। এমনি করে আমাদের জীবনসূর্যও অস্তমিত হতে চলেছে, কিছুই যে করা হ'ল না জীবনে—জন্মটা যে বৃথাই কেটে গেল।

সুর উদাত্ত হতে হতে এক সময় হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল। বুকে রইল শুধু তার ঝঙ্কার।

কিছুক্ষণ শুধু স্তব্ধতা।

মিনিটখানেক পরে ভৈরব আবার বাঁশী মুখে তুলল। এবারের সুরে সেই ভাবটাই যেন গভীর, আরও গভীর করে তুললে, তার সঙ্গে আরও কি যেন মেশানো আছে। বুঝলাম পুরিয়া বাজছে....শেষে বাজল বেহাগ। মিনিট পনের পরে বেহাগের কান্নাও শেষ হয়ে গেল...। ভৈরব বাঁশী থামিয়ে একবার শান্তির একবার আমার মুখের দিকে চাইল। শান্তি সুপ্তোত্থিতের মত জড়িত কণ্ঠে বললে, সেইটা —

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল—বৌবাজারের মোড়ে যে সুরটা বাজিয়েছিলে সেই—

কথা বলা আর আমার শেষ হল না,—ভৈরব তখন চোখ বুজে বাঁশী তুলে নিয়েছে মুখে—কম্পিত বক্ষে ভাবতে লাগলাম, আমার নির্দিষ্ট সুর বাজায় যদি শান্তির লাগবে আঘাত, আর শান্তির ইঙ্গিতমত বাজায় ত আমি পাব মনঃকষ্ট—

বেশিক্ষণ ভাবতে সময় পেলাম না। পরমুহূর্তে দেখি ভৈরব আমার সেই অতিপ্রিয় প্রথম দিনের শোনা আশোয়ারী সুরু করেছে। এক মুহূর্তের জন্য শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিরক্তি বা অসন্তোষের আভাস তাতে বিন্দুমাত্র নেই। পরমুহূর্তে শান্তির মত চক্ষু মুদ্রিত করে আমিও এক মহা আবির্ভাবের আশায় দ্বার উন্মুক্ত করে উন্মুখ হয়ে রইলাম। বাঁশী বাজতে সুরু করেছে—সুদূর থেকে যেন কার আহ্বান আসছে। সংসারের সকল চাওয়া পাওয়া, সকল বাঁধন ছাড়িয়ে নেওয়ার আকুল আহ্বান। উদাস করা সেই পরম প্রিয় যেন ক্রমেই কাছে আসছে —বড় কাছে এসে গেছে সে। হৃদয়ের সকল বাঁধন যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে, স্নায়ুগুলি সব খুলে খুলে যাচ্ছে, এ কি হ'ল আমার, আর একটু হলে সকল অনুভূতিও যে হারিয়ে ফেলব আমি। বুকটা দুই হাতে চেপে

ধরতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু সে শক্তিও আর নেই···নিষ্ঠুর বাঁশী বেজেই চলেছে—

প্রায় আধ ঘন্টা পরে বাঁশী থামল। একটু স্থির হয়ে চেয়ে দেখি শান্তি তখনও আধা উপুড় হয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে, বাইরে চেপে রাখলেও অন্তরটা আমারও ঠিক অমনি কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছিল—ভৈরবের দৃষ্টি শুধু মদির, ধ্যানস্তিমিত

সে রাত্রে বিদায় নেবার আগে ওদের সঙ্গে কথা বলা আর সম্ভব হ'ল না, মুখ থেকে বেরুল শুধু, 'চলি'—

নিঃসঙ্গ

লোকটির কথা মনে হলে এখনও কেমন যেন এক অস্বস্তিকর অনুভূতি জাগে আমার মনে, সে অনুভূতি ব্যাখ্যা করতে পারিনি আমি, শুধু কষ্ট পাই।

লোকটিকে প্রথম দেখি আমি দক্ষিণ কলিকাতার এক স্কুলে মাষ্টারি করতে গিয়ে। প্রথম দিন টিফিনের সময় টিচার্স কমন-রুমে ঢুকতেই দেখি শিক্ষকেরা আমার আগেই সেখানে এসে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ হয়ে নানা আলোচনা ও কাজে মত্ত হয়ে উঠেছেন। বয়স্কদের একদল খবরের কাগজ খুলে রাজনৈতিক আলোচনা সুরু করে দিয়েছেন, অল্পবয়সী কয়েকজন ঘরের এক কোণে উবু হয়ে বসে সিগারেট বিড়ি ফুঁকছেন। একজন ঘরের আর এক কোণে স্টোভ ধরিয়ে চা করছেন, আর তাঁরই চারদিকে পেয়ালা হাতে বসে আছেন কয়েকজন।

সবার দিকেই এক একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম আমি ; দেখে নিচ্ছিলাম এঁদের কার কার সঙ্গে ভাব হবে আমার। প্রভাতকমলের সঙ্গে এই একটু আগে ভাব হয়ে গেছে আমার। ঘরে ঢুকতেই সে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলে, তারপর এগিয়ে এল আমার সঙ্গে কথা বলতে। তারই সঙ্গে কি যেন কথা হচ্ছিল আমার এমন সময় ঘরে ঢুকলেন সেই ভদ্র লোক—যাঁর কথা আজ আমি আপনাদের কাছে বলতে যাচ্ছি।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই সোজা চায়ের সরঞ্জামের কাছে এগিয়ে গেলেন। সেখানে একটু দাঁড়িয়ে বললেন, কি—চায়ের জল প্রস্ফুটিত হচ্ছে ?—বলে নিজেই একটু হাসলেন।

ভদ্রলোকের এমন রসিকতায় কেউই কোন সাড়া দিলে না দেখে কেমন যেন একটু বেদনা বোধ করলাম। প্রভাতকে বললাম, এমন একটা রসের কথায় কেউ কোন সাড়া দিলে না কেন ?

প্রভাত গম্ভীর মুখে বললে, ওটা ওঁর নিজের কথা নয়।

তবে ?

ওটা ভাদুড়ীর কথা,—তিনি আজ আসেননি।

আর যে ভদ্রলোক এখন বললেন ও কথা,—ওঁর নাম কি?

ওঁর নাম ভবেশবাবু, ভবেশ ব্যানার্জি,—বলতে গিয়ে কুঞ্চিত হয়ে উঠল প্রভাতের চোখমুখ।

কিসের টিচার উনি?

কুঞ্চিত ললাটেই প্রভাত উত্তর দিলে, ইংলিশের। ভদ্রলোক বি, এ, বি, টি।

প্রভাতের উত্তর দেবার সুর ও ভঙ্গীতে বুঝলাম—ভদ্রলোককে ও তেমন পছন্দ করে না। দেখলাম ভবেশবাবু চায়ের চক্র থেকে সংবাদ-পত্রের মজলিসে এসে হাজির হলেন; কি, কি খবর,—anything sensational!

কেউ কোন উত্তর দিলে না। ভদ্রলোক সেখান থেকে সরে গিয়ে বসলেন এক বেঞ্চের উপর। সেখানে বসে এদিক ওদিক একবার চাইলেন, তারপর নিজের মনেই সামনের টেবিলের উপর—'তেরে কেটে তাক'—কি 'ধিন্ ধিনা ধাক'—বাজাতে সুরু করলেন। বাজনার রকম দেখে মনে হয় না তবলা বাজানো অভ্যাস আছে,—বুঝলাম এ শুধু তার সময় কাটানোর উপায়।

তখন থেকেই ভদ্রলোকের গতিবিধির উপর বিশেষ করে নজর রাখতে সুরু করলাম আমি। তাঁর সঙ্গে কোন কারণে কেউ কোনদিন একটি কথা বললেই দেখতাম খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর মুখ। দেখে বড় মায়া লাগত। তাঁর মনের দুঃখ বুঝে মাঝে মাঝে জোর করে কথা বলতে যেতাম আমি তাঁর সঙ্গে। কিন্তু সে এক মহা মুস্কিল। একটুখানি কথা বলার সুযোগ পেলেই তিনি একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। ছেড়ে আসা দায়। ফলে একদিন কথা বলার পর কয়েক দিন আর তাঁর কাছে ঘেঁষা সম্ভব হত না।

ভবেশবাবুর গতিবিধি সম্পর্কে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করেছি আমি: শিক্ষকদের কালি কলম বই রাখবার ড্রয়ার আর বসবার বেঞ্চের মাঝে সরু একটুখানি পথ, একটি ছাড়া দুটি লোক পাশাপাশি সেখান

দিয়ে যেতে পারে না। ভবেশবাবু—প্রায়ই দেখি—সেখানে এসে দাঁড়ান। বিশেষ যে কোন কাজ আছে সেখানে তার কোন লক্ষণ দেখতে পেলাম না আমি কোনদিন। ব্যাপার দেখে আমার কেমন সন্দেহ হত; প্রায়ই মনে হত—ভবেশবাবুর এ কার্যটি সচেতন না হলেও অবচেতন মনের ইচ্ছাকৃত: তোমাদের কারো ইচ্ছা না থাকলেও কথা বলতে হবে আমার সঙ্গে বাধ্য হয়ে! বলতে হবে, ভবেশবাবু একটু সরে দাঁড়ান।

মাঝে মাঝে দেখেছি—ভবেশবাবুকে—একা একা কিছুক্ষণ বসে থেকে চা-চক্রের দিকে এগিয়ে যেতে। চা-চক্রের সভ্যগণ হয়ত চক্রধর মতিবাবুর চারিদিকে পেয়ালা হাতে ভিড় করে বসেছেন—এমন সময় ভবেশবাবু গিয়ে তাদেরই মাঝে বসে বলে উঠলেন—এক ছিটে হবে?—অথচ মতিবাবু একটু দিতেই তিনি বলে ওঠেন, হয়েছে, হয়েছে,—অতটা কেন,—এক ছিটে ত চেয়েছি!

এ চা-খাওয়া ব্যাপারটাও আমার কেমন সন্দেহ হয়,—কারণ অনেক দিন দেখেছি তিনি অনাহূত—সোৎসাহে চা-পানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে সুরু করেছেন: পয়সা খরচ করে ও বিষ খাওয়া কেন, তা-ও আবার দুপুরে, তা ছাড়া আবার এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে।

সবার চেয়ে করুণ লাগত যখন তিনি কারো সঙ্গে আলাপ জমাতে না পেরে বারান্দায় বেরিয়ে ছেলেদের সঙ্গে দু'চারটে কথা বলতে যেতেন। স্বভাবচপল ছেলেরা বহুক্ষণ আটক থাকবার পর টিফিনের সময় মুক্তি পেয়ে আরও চঞ্চল হয়ে উঠত, ভবেশবাবুর কথায় সংক্ষেপে কি একটা উত্তর দিয়ে অথবা না দিয়েই তারা খেলা অথবা লোভনীয় কোন খাবারের দিকে ছুটে যেত। ভবেশবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিক একটু চেয়ে মন-মরা হয়ে কমন-রুমে ফিরে আসতেন।

একটা গভীর বেদনামিশ্রিত সহানুভূতির সঙ্গে ধীরে ধীরে একটা কৌতূহলও জেগে উঠছিল আমার মনে: বাড়িতে তাঁর আপন জনের কাছে কেমন ব্যবহার পান তিনি!—এই ইচ্ছার বশবর্তী হয়েই আমি ভবেশবাবুর সঙ্গে ধীরে ধীরে মেলামেশা সুরু করলাম। ভবেশবাবুকে একদিন ডেকে বেঞ্চে আমার পাশে বসিয়ে আমি যখন তাঁর সঙ্গে আলাপ সুরু করলাম,

তখনকার তাঁর আনন্দোচ্ছ্বাসিত মুখের কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। একটু কথা বলতে সুযোগ পেতেই তিনি যেন পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন : তাঁর বাড়িওয়ালা কেমন পাজী, গিন্নী কেমন বুদ্ধিমতী, সুন্দরী আর গীতবাদ্যনিপুণা। —সেদিনকার সেই এক সিটিংয়েই শুনলাম ভবেশবাবুর ছেলেমেয়ে পাঁচটি, চারটি মেয়ে একটি ছেলে,—ছেলেটি কনিষ্ঠ। মেয়েগুলি সবাই মায়ের গুণ পেয়েছে, গান-বাজনা নিয়েই আছে। দুটি আবার নাচ শিখছে। পরিচয় দিতে দিতে হঠাৎ একবার উচ্ছ্বাসবশতঃ ভবেশবাবু বলে বসলেন, একদিন ছুটির পর আসুন না আমার বাড়িতে, চা খাবেন।

ঠিক এই জিনিষটাই চাইছিলাম আমি।

একদিন স্কুলের ছুটির পর তাঁর বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ সত্যিই আমার ঘটল। তাঁর বাড়িতে সেদিন ছোটখাটো একটু ব্যাপারও ছিল ;—উপলক্ষ্য তাঁর ছেলের জন্মদিন। কথাটা ভবেশবাবু খোলসা করেই বলেছিলেন, তাই যাবার আগে দোকান থেকে দুটো খেলনা কিনে নিয়ে গেলাম।

গিয়ে দেখলাম নিমন্ত্রিতের মাঝে ভবেশবাবুর বন্ধু শুধু আমি, আর সবাই প্রায় তাঁর স্ত্রীর। কারো বা তিনি দিদি, কারো বৌদি, কারো মা,—আবার কারো বা শুধু বন্ধু। বয়সে প্রায় সবাই তরুণ। শোবার ঘরে খাটের উপর বিছানায় কেউ বা শুয়ে, কেউ বা বসে, কেউ বা বালিশ ঠেসান দিয়ে গল্প করছে গৃহস্বামিনীর সঙ্গে। গিন্নী পাঁচ-ছেলের মা হয়েও চোখের বিদ্যুৎ খোয়াননি তখনও। আমার দিকে নজর পড়তেই মৃদু হেসে মাথায় একটু কাপড় টেনে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ভবেশবাবু শোবার ঘরেই আহ্বান করছিলেন আমায়, কিন্তু আমার তা তেমন পছন্দ হলো না। দেড়খানা ঘরের বাইরের আধখানায় একখানা বেঞ্চ পাতা ছিল, আমি তাতেই বসে বললাম, না, এইখানেই বসা যাক্।

ঘরটা বড় গরম। আমি ঘামছি দেখে ভবেশবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, ইস্, নেয়ে উঠলেন যে!···দাঁড়ান পাখা আনিয়ে দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চীৎকার সুরু করলেন : মাধু,—মাধু—

কেউ সাড়া দিলে না। ভবেশবাবু কণ্ঠের সুর আর এক পরদা চড়িয়ে ডাকলেন, মাধু, একখানা পাখা নিয়ে আয়, ও মাধু, শুনছিস?

যাচ্ছি-ই : কণ্ঠে বিরক্তি। গল্প ছেড়ে আসতে ইচ্ছা করছে না তার। একটু পরে এল মাধু, হাতে পাখা নেই, মুখে রয়েছে বিরক্তির রেখা : কি বলছ ?

একখানা পাখা আনতে বললাম যে তোকে !

মাধু মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল : পাখাটাও হাতে করে নিয়ে যেতে পারো না ?

ভবেশবাবু বোকার মত কেমন একটু হাসলেন। সে হাসিকে করুণ বলা যায় না, কারণ তা দেখে করুণার উদ্রেক হয় না, হয় কেবল রাগ।

মাধু এর পর পাখা হাতে করে এল বটে, কিন্তু সে পাখা দিয়ে বাতাস খেতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না আমার। ভবেশবাবু বললেন, বসে বাতাস খান, এক গ্লাস জল খেয়ে আসি আমি।

মানসচক্ষে আর দেখবার প্রয়োজন হল না, খোলা দরজাপথে এই দুটো স্থূল চর্মচক্ষু দিয়েই দেখলাম, ভবেশবাবু নিজে হাতে কুজো থেকে জল গড়িয়ে খাচ্ছেন, গিন্নী দেখলাম চা-পানরত অতিথিদের সঙ্গে হাসিমুখে গল্পে মসগুল।

ভবেশবাবুকে স্কুলে দেখে আমি যে কষ্ট পেয়েছিলাম তার চেয়েও বেশি কষ্ট লাগছিল আমার তাঁকে তাঁর নিজের বাড়িতে দেখে। একটু পরে ভিতরের ঘরে আমার খাবার ডাক পড়ল। ভিতরে যেতে আমার একেবারে ইচ্ছা করছিল না, বললাম, আবার ও ঘরে কেন, এখানেই হ'ক না।

ভবেশবাবু সে কথা বলতে গিয়ে শুনলাম—ধমক খেলেন !

স্কুল থেকে সোজা এখানে এসেছি, হাতমুখ ধোওয়া হয়নি,—বললাম, হাতমুখ ধোওয়ার একটু—

ভবেশবাবু নিজেই একটা য়্যালুমিনিয়ামের জগে করে জল নিয়ে এলেন। এর পর খাবার এল কিন্তু বড় মেয়ে রাধুর হাতে। রাধুর মা দরজার ধারে এসে দাঁড়ালেন, মুখে কেমন এক মধুর হাসি।

ও চপখানা খা'ন, আমি নিজে করেছি,—কথা বললেন তিনি আমার সঙ্গে। খিদে ছিল খুবই, সুতরাং গৃহকর্ত্রীর আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করলাম। নিজের খিদের বহর দেখে ভবেশবাবুর কথাও মনে পড়ে গেল। বললাম, আপনিও বসে গেলেন না কেন—এইবার ?

ভবেশবাবু অসহায়ের মত তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন।

তুমি পরে খাবে : প্রায় ধমকের মত শোনালে শ্রীমুখের বাণী।

এর পর চা এল,—ভবেশবাবু নিজেই নিয়ে এলেন। শোবার ঘরের ভিতর থেকে আসা আওয়াজে বুঝলাম ভবেশবাবুর নৃত্যনিপুণা মেয়েরা নাচের জন্য পায়ে ঘুঙুর পরছে। নিমন্ত্রিত তরুণদের একজন হারমোনিয়াম ধরলেন। ভবেশবাবু আমার সামনে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত যেন ভয়ে ভয়ে বললেন, এইবার নাচ হবে!

আমার ইচ্ছা করছিল তাঁর গালে মোক্ষম জোরে এক চড় বসিয়ে বলি, তুমি একটি অপদার্থ, এর চেয়ে বনে গিয়ে বাস করা তোমার ঢের ভাল ছিল।

ও বাড়িতে আর ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে ইচ্ছা করছিল না আমার। ছ'টায় আর একটা 'এনগেজমেণ্ট' আছে আমার—বলে আমি তখনই বিদায় চাইলাম। গৃহকর্ত্রী ছেলে কোলে করে এসে দাঁড়ালেন দরজায়, মিষ্টি হেসে তিনি বললেন, কিছুই ত যত্ন করতে পারলাম না, আর একদিন আসবেন।

হয়ত আমার বলা উচিত ছিল, নিশ্চয়, আসব বই কি!—কিন্তু তা আর আমি কিছুতেই পেরে উঠলাম না।

এর পর থেকে ভবেশবাবুর জন্য আরও বেশি কষ্ট হ'ত আমার,—কিন্তু আশ্চর্য—অনেক চেষ্টা করেও আমিও তাঁর সঙ্গে বেশি কথা বলতে পারতাম না। কিছুদিন পরেই আমি ও স্কুল ছেড়ে দিই।

স্কুল ছাড়বার বছর দু'য়েক পরে এক রবিবারের বিকেলে ঐ স্কুলের সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখি ছেলেদের একটু ভিড়।

কি ব্যাপার কি?

দারোয়ান মৃদু হেসে বললে,—ভবেশবাবুর ফিয়ার ওয়েল,—বাবু!

ভবেশবাবুর ফেয়ার ওয়েল,—কেন, কোথায় যাচ্ছেন তিনি?

মফস্বলের কোন স্কুলে বেশি মাহিনায় হেডমাষ্টার হোয়ে যাচ্ছেন তিনি।

কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম স্কুলের মাঠের দিকে। আমি যখন সভায় উপস্থিত হলাম তখন ভবেশবাবু বলতে সুরু করেছেন : এ স্কুল ছেড়ে যেতে যে আমার কি কষ্ট হচ্ছে তা আমি বলে বোঝাতে পারি

না,—এ স্কুলে আমি আমার জীবনের পঁচিশ বৎসর কাটালাম, সুতরাং কি কষ্ট যে আমার হচ্ছে তা আমি—

—বলতে গিয়ে ভবেশবাবুর দুই চোখে জল এসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা হাসতে আরম্ভ করলে : এরে, এরে, ত্থাখ রে ভবেশবাবু কাঁদছে!

হেডমাষ্টার তাড়া দিলেন। ছেলেরা অনেকে হাসি চাপতে না পেরে সেখান থেকে ছুটে পালাল। কোঁচার খুটে চোখ মুছে নিয়ে ভবেশবাবু আবার সুরু করলেন : এখানে সবাই আমার সঙ্গে বড় ভাল ব্যবহার করেছেন। সহকর্মীদের যে প্রীতি এবং ছাত্রদের যে শ্রদ্ধা ভক্তি আমি পেয়েছি,কমন-রুমে সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পগুজব করে যে আনন্দ আমি পেয়েছি, তা আমি জীবনে ভুলব না······

এবার দেখি হেডমাষ্টারও মুখ নীচু করে মৃদুমৃদু হাসতে সুরু করেছেন। ভবেশবাবুর জীবনে—এমনি করে তাঁর কথা কেউ শুনতে চায়নি কোনদিন, তাই কথা বলার উৎসাহ যেন তাঁর ক্রমেই বেড়ে চলল। এদিকে সভায় তাকিয়ে দেখি একটু পরেই লোকজন সব সরতে আরম্ভ করেছে। যত লোক সরে ভবেশবাবুর বক্তৃতায় উচ্ছ্বাস ততই যেন বাড়ে। ভবেশবাবু বক্তৃতা শেষ করে যখন আসন গ্রহণ করলেন, তখন সভাস্থল প্রায় জনশূন্য।

স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা না থাকলেও ভবেশবাবুর সঙ্গে দু'একটা কথা বলা কর্তব্য বোধ করছিলাম, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না,—সভা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাত আমায় একরকম হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল চায়ের দোকানে। হয়ত প্রভাত আমার ভালই করলে, বাঁচিয়ে দিলে সে—কারণ ভবেশবাবুর সঙ্গে বলবার মত কথা আমি নিজেও খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

এর প্রায় মাস তিনেক পরে—ভবেশবাবু আগে যেখানে থাকতেন সেইদিকে আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ফিরবার পথে হঠাৎ দেখি মাধু—ভবেশবাবুর মেয়ে।

—তুমি মাধু—না?

মাধু মৃদু হেসে মাথা দুলিয়ে জানালে,—হাঁ।

তোমরা যাওনি এখান থেকে,—তোমার বাবা না কোথায় হেডমাষ্টার হয়ে গেছেন?

মাধু গম্ভীর হয়ে বললে, হাঁ, বাবা গেছেন, আমরা এখানে আছি।

তোমার মা-ও এখানে ?

মাধু ঠোঁট উলটে বললে,—হাঁ সেখানে সেই অজ-পাড়াগাঁয়ে আমাদের কারো মন টেকে না, একবার গিয়েছিলাম আমরা বেড়াতে।

ভবেশবাবুর জন্ম মনটা আমার সত্যিই বড় কেমন করে উঠল, অদ্ভুত ধরনের কেমন একটা দুঃখের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। কল্পনায় আমার চোখের সামনে কেবলি ভেসে আসতে লাগল—ভবেশবাবু সঙ্গলিপ্সু হয়ে যেন পাড়াগাঁয়ের একটা মেটে ঘরের বারান্দায় ডেক-চেয়ারে বসে আছেন, কাউকে দেখতে পেলেই হয়ত ডাকছেন, ভটচাজমশায় শুনুন, দত্তমশায় শুনুন। ওঁরা সবাই যেন কাজের অছিলায় দ্রুত ছুটে পালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর কাছ থেকে। নিরুপায় ভবেশবাবু তখন টেবিলের অভাবে ডেক-চেয়ারের হাতলেই তেরে কেটা তাক্ ধ্বনি তুলবার চেষ্টা করছেন।

সমাপ্তির পূর্বপরিচ্ছেদ

বাড়িটায় ঢুকবার আগে যেন মেয়েদের জলতরঙ্গ বাজে : কলসীর গায়ে লেগে চুড়ীর ঠুনঠান—মিহিগলায় ফিসফিসিয়ে কথা—চাপা হাসি, দ্রুত চলার শব্দ,—সব কিছু মিলিয়ে বেশ একটা মিঠে আওয়াজ উঠতে থাকে। গেটটা পার হলেই সব চুপ। দূরে নেকড়ের আভাস পেয়ে হরিণের দল যেন সন্তর্পণে পালিয়ে যাচ্ছে। একটু শব্দ হলেই বাইরের ঘর থেকে হাঁক আসে—কেডা যায় ?

শব্দায়মানা আর একটু সতর্ক হয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে কোনরকমে এই ঘরের এলাকাটুকু পার হয়ে যায়। বর্ষীয়সীরাও অনেকে এই পথ দিয়ে ঘাটে যায়। তারা আর অত সতর্ক হয় না—মাঝে মাঝে তাই বাবুরামের ডাকে সাড়া দিতে হয় তাদের, কাছে গিয়ে হু'চারটে কথাও বলতে হয়। হাজার হলেও বাবুরামকে তারা ছেলেবেলা থেকেই দেখছে। আগে কত ভয়ই না তাঁকে করেছে,—এখনকার এই দশা দেখে একটু মায়া না লেগে পারে না,—অনেকে তাই এদিক ওদিক একটু তাকিয়ে উঠে আসে বাবুরামের ঘরে—

কে,—মোক্ষদা ?

হাঁ।

আসো, বসো, মোক্ষদা।

বাবুরামের ঘরে বসবার মত অবশ্য কোন কিছুই নেই, বাইরের বারান্দায় আছে জলচৌকি,—আর বেঞ্চ—পুরুষদের বসবার জন্য। মোক্ষদা তাই মেটে ঘরের মেঝেতেই উঁচু হয়ে বসে বলে,—কেমন আছেন জ্যেঠামশায় ?

দৃষ্টিহীন চোখদুটির পাতা কয়েক বার পিট পিট করে, ঠোঁট দুটি কাঁপতে থাকে—বাবুরাম কান পেতে বুঝে নেয়—কেউ আছে নাকি কাছাকাছি কোথাও,—অন্ধ হবার পর ওর কানের শক্তি যেন অসম্ভবরকম বেড়ে গেছে। কেউ কাছে নেই বুঝতে পেরে বাবুরাম অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, কাল আত্তিরে আবার···আগোয়ে আয়····আয়—দেখবি পিঠে কেমন—

মোক্ষদা হয়ত এগিয়ে এসে বুড়োর পিঠে হাত বুলিয়ে একটু সান্ত্বনা দিত,—কিন্তু পিছনের দরজা খোলা,—এবং বাবুরাম দেখতে না পেলেও মোক্ষদা দেখতে পায় বাবুরামের পুত্রবধূ শ্রীমতী ভাটার মত দুই চোখ করে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। উঠানে ধান নাড়তে এসেছিল সে।

মোক্ষদা হঠাৎ ভোল পালটে বাবুরামের উদ্দেশে বলে ওঠে, কি জানি বাপু,—রোজ রোজ তোমাগারে এ কুকুরকাণ্ডালি যে ক্যান বাধে বুঝিনে আমরা।

বাবুরাম অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, কেডা—ওরা কেউ আইচে না কি ?

মোক্ষদাও স্বর অতি নীচু করে বলে, হুঁ,—তারপর গলা একটু চড়িয়ে বলে, যাই,—বেলা হইচে,—এট্টা ডুব দিয়ে আসি।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে বাবুরামের—তারপর অনেকটা জাবরকাটার মত করে মুখ নাড়ে সে।

মোক্ষদা চলে গেলেই শ্রীমতী এগিয়ে আসে বুড়োর ঘরের কাছে : কি, কি লাগানো হচ্ছিল ও বাড়ির দিদির কাছে—বুড়ো খোস্তা,—অনেক দুঃখু আছে তোমার কপালে।

বাবুরাম সে কথা জানে এবং জানে বলেই জবাব দিয়ে আর ভবিষ্যৎ দুঃখের কারণ বাড়ায় না। শ্রীমতী শ্বশুরকে শাসিয়েই চলে যায়, বাবুরামের জ্যোতিশূন্য চোখের পাতা দুটি আর্দ্র হয়ে ওঠে,—তা অবশ্য কেউ দেখতে আসে না। তা না আসুক তাতে তেমন দুঃখ লাগে না বাবুরামের, তার দুঃখ—মনের কথা খুলে বলবার একটা লোক পায় না সে পাশে,—অথচ কত কথা তার বলতে ইচ্ছা করে।

মাঝে মাঝে নির্বিঘ্নে কথা বলবার—একটু আধটু সুযোগ অবশ্য মিলে যায় : শ্রীমতী হয়ত গিয়েছে ঘাটে, আটচল্লিশ বছর বয়সের পুত্র মতি হয়ত গিয়েছে হাটখোলায় তার আড়তে,—আর বাড়ির ঝি ঝড়ুর মা হয়ত বাড়ির বাগানের এক কোণে জ্বালানীর জন্য শুকনো পাতা কুড়োচ্ছে,—এমন সময় হয়ত ঠুনঠুন করো চুড়ির শব্দ শোনা গেল। শ্রীমতী বাড়ি থাকলে যারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে চায়, হাতে সময় থাকলে তার অনুপস্থিতিতে দু'একজন কৃপা করে বুড়োকে একটু সঙ্গ দান করতে কার্পণ্য করে না,—বিশেষ করে

পাড়ার নূতন বউয়েরা—যারা গ্রাম্য সম্পর্কে বুড়োর নাতবৌ : বুড়ো বড় মজার মজার কথা বলে। এই মজার কথা শুনবার লোভে পাড়ার তিনটে বৌ অন্ততঃ সুযোগ বুঝলেই বুড়োর সঙ্গে দুই চারটা কথা বলে তাকে কিছুটা আনন্দ দিয়ে যায়।

শ্রীমতী বাড়ি নেই বুঝতে পারলেই বুড়োর ঘরের কাছে এসে ওরা বেশ একটু জোরে জোরে চুড়ী বা কলসীর মিঠে বোল তুলতে থাকে। ওদের যাতায়াতের সময়ও বুড়োর মুখস্থ, উৎকর্ণ হয়েই থাকে বাবুরাম। আওয়াজ কানে যেতেই হাঁক দেয় : কেডা যায় ?

বউটা এগিয়ে কাছে এসে বলে, আমি।

স্বর শুনেই বোঝে বাবুরাম, বলে—গোলাপ বউ ? বোস, বোস।

গোলাপ বউ কলসীটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বলে, কি,—তামুক সাজে দেব ?

তামুক ?—

তামাকের নাম শুনেই বুড়ার গোলগাল মুখখানা খুশিতে চকচক করে ওঠে,—কৌতুকস্পৃহা মুহূর্তের জন্য মনের তলে ছোট্ট একটা ডুব দেয় : তামুক—দিবি ত দে সাজে এক ছিলুম। দেখ ত আগুন আছে না কি মালসায় ?

আছে,—না থাকলি কি বুলতিছি ?

খুশিতে ফোকলা দাঁতে শিশুর মত হাসতে থাকে বাবুরাম, তারপর হঠাৎ হাসি থেমে গিয়ে মুখে কেমন এক ভীতির চিহ্ন ফুটে ওঠে তার : ও আসছে না ত ?

কে,—কাকীমা ?

হুঁ।

উঁহুঁ—

কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে হুকোতে বসিয়ে তুলে দেয় গোলাপ বউ বাবুরামের হাতে। বাবুরাম হুকোতে জোরে জোরে কয়েকটা টান দিতে দিতে বলে,—তুই যাস নে, গোলাপ-বৌ, বস, কথা আছে তোর সঙ্গে।

বাবুরাম কিছুক্ষণ কথা বলে না,—গম্ভীর মুখে শুধু হুকোয় টান

দিতে থাকে, তারপর এক সময় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে, ভালই আছিস বোন,—মিছে লোক ওগারে চায়।

কি বুলতিছেন আপনি,—বুঝিনে—

বুড়ো চোখ দুটি পিট পিট করে বলে,—বুলতিছি আমি ছাওয়াল পার্লের কথা,—ওরা না হলিই ভাল,—দেখতিছিসনে আমার দশা।

গোলাপ বউয়ের চোখ দুটি সহানুভূতিতে কেমন কাতর হয়ে ওঠে। সান্ত্বনা দিতে কি যেন বলতে যায় সে, কিন্তু বলা আর হয়ে ওঠে না, ঘরের পিছন থেকে বাঘিনীর গর্জন কানে আসে—ঘরে কেডা ও ?

গোলাপ বউ হকচকিয়ে উঠে জবাব দেয়, আমি কাকীমা।

আমি কাকীমা!—আমাগারে বা'র বাড়ি শেষে তোর গাওের ঘাট হয়ে উঠল না কি ? আসুক নিবারণ, নিবারণেরে পালি তোর মজা দেখাচ্ছি আমি, তোর আড্ডা দেওয়া ঘুচোয়ে দিচ্ছি।

গোলাপ বউয়ের চোখ দুটি তরাসে হয়ে ওঠে, সে তখনই কলসীটি কাঁখে নিয়ে বাবুরামের একেবারে কাছে গিয়ে বলে,—স্থান, হুকোটা স্থান, আমি রাখে যাই।

বাবুরামের কলকেতে তখনও বস্তু আছে,—হুকো ছাড়তে বুঝি মায়া লাগে—ক্ষুণ্ণ সুরে সে বলে, তুই যা গোলাপ বউ,—আমিই রাখতি পারবো।

এর পর গোলাপ বউ কয়েকদিন আর বাবুরামকে সঙ্গ দিতে আসে না, মোক্ষদাও বুঝি সাহস পায় না। শ্রীমতীর শানিত জিহ্বাকে ভয় করে না, এমন মেয়ে গ্রামে নেই। বাবুরাম একা একা বসে হাতড়ে হাতড়ে নিজের হাতে সাজা তামাক খায়, আর ভাবনার জাবর কাটে: নারকেল গাছগুলি এখন কত বড় হয়েছে,—এখনও কি তাতে কাঁদি কাঁদি নারকেল ধরে,—গাছ পরিষ্কার করে কি ওরা,—লেংড়া, বোম্বাই আমের কলমের গাছগুলিতে এখনও কি তেমনি আম দেয় ? ক্ষেতের ধান আগেকার মত আদায় হয় না—বাবুরাম তা 'মলন' ঘুরোবার বহর দেখেই টের পায়। ধান কাটার সময় বাবুরাম সেই কোন ভোরে উঠে আলু বেগুন ভাতে দুটি ফেনা-ভাত খেয়ে ঐ যে মাঠে যেত,—আসত সেই সন্ধ্যাবেলায়। সংসারটাকে বেঁধে তুলবার জন্ত

কি কঠোর পরিশ্রমই না সে যৌবনে আর মধ্যবয়সে করেছে। কিশোর বাবুরামের বাপ যখন মারা যান, তখন তিনি তার জন্মে রেখে গিয়েছিলেন শুধু মাঠান পাঁচ বিঘে জমি, আর পুরানো পাড়ায় আট কাঠা জমির উপর একটুখানি বাঁশঝাড় আর একখানা শন-খড়ের ঘর। বাবুরাম নিজের চেষ্টায় নদীর ধারে ছ'বিঘে বাগান আর তার মাঝে হাতীর মত এই চার চারখানা ছাদ-আঁটা টিনের ঘর তুলেছে—দক্ষিণের মাঠে করেছে সে পৌনে দুশো বিঘে জমি।—এ সবকিছুর পর অপত্য স্নেহ তার। মতি পঁচিশ বিঘে মাঠান জমি বিক্রী করে পাটের ব্যবসা করবে বলে বায়না ধরেছিল, বাবুরাম তা দেয়নি—সেই থেকে মতির বাপের উপর রাগ।

সে প্রায় দশ বৎসর আগেকার কথা: বাবুরাম তখনও অন্ধ হয় নি, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে শুধু। ছেলে ও ছেলের বউয়ের সেই থেকে সে চক্ষুশূল হয়ে আছে। প্রত্যাখ্যাত মতির সেই দিনের সেই কটু উক্তির কথা ভাবলে এখনও বাবুরামের মনে হয় উত্তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে অকস্মাৎ কে যেন তার দুই কর্ণবিবর বিদ্ধ করে দিল: বুড়ো খোস্তা! ও বুড়ো খোস্তা ঐ জমি তুই সঙ্গে করে নিয়ে যাবি?—

বুড়ো বাপকে এমনি তুই-তোকারি করতে পাড়াগাঁয়ের নিম্নশ্রেণীদের মধ্যেও খুব বেশি দেখা যায় না। সেই থেকে বাবুরামের ভাগ্য একরকম নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী নিস্তারিণী এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাপের বাড়ি—মানে এখনকার ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। নিস্তারিণী বাবুরামকেও সেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিল,—এরা তাতে এমন কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলল যে, শেষ পর্যন্ত তা আর পেরে উঠল না। নিস্তারিণীর ভাই প্রিয়নাথের মাথার বাঁ-পাশটা মতির লাঠির ঘায়ে জখমই হয়ে গেল। আসলে মতি আর শ্রীমতীর ভয়—বুড়োকে ওখানে নিয়ে গিয়ে সম্পত্তিটা ওদের নামে লিখিয়ে নেবে। প্রিয়নাথ তাদের প্রথমে মিষ্টি করেই বুঝিয়েছিল—জমি জমা তারও কিছু কম নেই, আর মতিকে সে আপন ভাগনের মতই ভালবাসে—সুতরাং মতির এ শঙ্কার কোন কারণ নেই। কিন্তু মতির মন থেকে এ ভয় যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, কারণ এ ভয় তার নিজের মনেরই অপরাধবোধ থেকে উদ্ভূত। আর এর

জন্তই নিস্তারিণী হ'ল বিতাড়িত আর অন্ধ বাবুরাম হ'ল সতর্ক পাহারায় বন্দী।

কারাগারের বন্দী নিজের কর্মফল ভোগ করে—আর মুক্তির দিনের স্বপ্ন দেখে,—কিন্তু বাবুরাম কি অপরাধ করেছে ভেবে পায় না। দ্বিতীয়-পক্ষের বিয়ে?—কিন্তু এ ছাড়া ত গত্যন্তর ছিল না? এ ত দেশের সবাই করে,—তা ছাড়া মতির মা যখন মারা যায়, মতি তখন একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু,নিস্তারিণী ঘরে না এলে তাকে মানুষ করত কে,—বাবুরামের ত সারা বছর মাঠে মাঠেই দিন কাটত,—বাড়িতে যেটুকু সময় থাকত, তাও কাটত তার কোদালি আর নিড়ানি হাতে বাগানে, সন্তান মানুষ করবার ফুরসুৎ ছিল কই তার?

বাবুরাম নিজের হাতে তামাক সেজে ডাবা হুকো টানতে টানতে নিজের জীবনের এই সব কথা যে কতবার ভেবেছে তার ইয়ত্তা নেই। বাবুরামের সবচেয়ে বড় কষ্ট তার কথা বলবার লোক নেই। ভগবান তার দুটি চোখ নিয়েছেন,—বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবার একমাত্র উপায় তার এখন লোকের সঙ্গে দুটি কথা, তাও তার ভাগ্যে জোটে না—এই তার বড় দুঃখ। মতি আর শ্রীমতীর অলক্ষ্যে এর ওর সঙ্গে দুটি কথা বলবার জন্ত বাবুরাম তাই দিন-রাত কাণ খাড়া করে বসে থাকে। গোলাপ বউ শ্রীমতীর কাছে সেদিন ধমক খাওয়ার পর থেকে এ পথ দিয়ে নদীর ঘাটে এমন সন্তর্পণে যায় যে, বাবুরাম তার পাত্তাই পায় না। ও পাড়ার নন্দর মেয়ে সুন্দরীর সাহচর্যও বাবুরাম প্রায় হপ্তাখানেক পায় না, যশোদাও আর আসে না। অনেকক্ষণ তামাক খেতে না পেয়ে তামাকখোরদের পেটটা যেমন ফুলে উঠতে চায়, বাবুরামের বুকের ভিতর ঠিক সেই রকম কেমন যেন একটা অনুভূতি হচ্ছিল,—এমন সময় হঠাৎ বাবুরাম তার ঘরের সামনে স্পষ্ট করে পায়ের শব্দ শুনতে পেল: নির্ভীক নিঃসঙ্কোচ অনতি-উচ্চ ভদ্র পায়ের ধ্বনি। সারাদিন পায়ের ধ্বনি শুনবার জন্ত কাণ পেতে থেকে থেকে বাবুরাম এখন পায়ের শব্দ শুনেই লোকের অন্তত তখনকার সাময়িক মনের অবস্থাটা বুঝে ফেলতে পারে। বাড়ীর ভিতরকার এই রাস্তাটা দিয়ে ঘাটে যাবার

অধিকার থেকে অবশ্য প্রতিবেশী পুরুষরাও বঞ্চিত নয়,—তবু মেয়েদের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হবার ভয়ে তাদের অনেকেই গ্রামের সবচেয়ে বড় ঘাট হাটখোলার ঘাটে যায়।

অনেকদিন পর স্পষ্ট নির্ভীক পুরুষের পায়ের শব্দ শুনে উল্লসিত বাবুরাম বিরুদ্ধ-পরিবেশের সব কিছু বিস্মৃত হয়ে হাঁকলে, কেডা যায় ?

আমি, দাদা।—স্পষ্ট নির্ভীক কণ্ঠস্বর।

আমি—কেডা ?

আমি সুখেন্দু।

সুখেন্দু কেডা ?

সুখেন্দু হো হো করে হেসে উঠল : ক'দিন গ্রাম ছাড়া বলে নাতির কথা একেবারে ভুলেই গেলেন। আমি রায় বাড়ীর সুখেন্দু—সুখু, সুখুর কথা ত আপনার ভুলবার কথা নয় ! একবার সন্ধ্যার আঁধারে আপনার গাছের ডাব চুরি করতে গিয়ে কেমন কাণমলা খেয়েছিলাম আপনার হাতে—মনে নেই ?

সুখেন্দু হাসতে হাসতেই উঠে গেল ঘরে বাবুরামকে প্রণাম করতে, কিন্তু পরক্ষণে তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই সুর গেল তার পালটে : এ কি দাদা, আপনার চোখের এ অবস্থা······?

বাবুরামের পলকহীন চোখের পাতদুটি একবার পিট পিট করে উঠল, কোন কিছু চিবানোর ভঙ্গীতে ঠোট দুটি একবার নড়ে উঠল। সুখেন্দু প্রণাম করতে বাবুরাম তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলে, বেঁচে থাকো, শতজীবী হও,—সুখে থাকো···বসো।

বসছি,—কিন্তু আপনার এ অবস্থা হয়েছে কতদিন ?

সহানুভূতির সুর শুনে বাবুরামের চোখের পাতা দুটি আর্দ্র হয়ে উঠল, বললে, তা বছর দশেক হবি,—খোঁজ খবর ত আর রাখ না।

হাঁ, দাদা, অনেকদিন দেশে আসতে পারি নে,—প্রায় বছর বারো হবে।

হুঁ—তা একাই আইছ ?

না, ও সঙ্গে আছে।

ও কেডা ?

সুখেন্দু মৃদু হেসে উত্তর দিলে, আপনার নাতবৌ—।

ও: নাতবউ,—তা ছাওয়ালপালগুলোরে সব রাখে আলে ?—কার কাছে রাখে আলে ?

ছেলেপিলে ত আমাদের কিছু হয়নি দাদা !

ভাল, শুনে খুশি হলাম,—বাঁচিছিস ভাই, বাঁচিছিস—

সুখেন্দু আধুনিক যুবক, জীবনের প্রথম দিকে সন্তান কামনা করে না সে অন্য কারণে, বৃদ্ধ প্রাচীনপন্থী বাবুরাম মুখে এমন কথা উচ্চারিত হতে শুনে সে বেশ একটু বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, দাদা, আপনি যে এমন কথা বলছেন ?

বাবুরাম সে কথার সোজা উত্তর না দিয়ে বললে, কয়েকদিন আছ ত ?

সুখেন্দু মৃদু হেসে জবাব দিলে, হাঁ,—এতদিন পরে এলাম একেবারে কাল-পরশুই যাচ্ছি না। তা ছাড়া পিসীমার ভীষণ অসুখ, সেই খবর পেয়েই ত—

বাবুরাম ব্যগ্র হয়ে মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল, মাতুর অসুখ, কি অসুখ, কই শুনি নেই ত ! পরক্ষণেই ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, আর কেডাই বা আমায় বুলবি,— হাঁ—অনেকদিন এ পথ দিয়ে ঘাটে যায় না বটে,—আমার এখানে আসে না !··· কি অসুখ তার ?

সুখেন্দু বললে,—পিসীমার আসল অসুখ বার্ধক্য, সঙ্গে বাত আছে, হার্টের অসুখ আছে।·······ছেলেবেলায় কোলে-কাঁখে করে মানুষ করেছেন,—মায়ের চেয়ে বড়।

নিচ্চয়, নিচ্চয়,—একথা কয়জনে বোঝে বলো,—তা তুমি কি পিসীমারে এবার সঙ্গে করে নিয়ে যাবা মনে করিছ ?

আমরা ত নিতেই চাই,—উনি যে যেতে চান না, দাদা, বলেন, বাপ-ঠাকুরদার ভিটে,—এ ছেড়ে আমি কোথায় যাব ?

আহা,—সত্যিই ত,—এ ছাড়ে যাওয়া কি সহজ,—আর মুখে দেখ, ভাই—আমার এ বাড়ি-ঘর-দোর-বাগান আমি নিজের হাতে তৈরী করিছি,—এর উপর আমার কতখানি হতি পারে ! তা না হলি সন্তোষ আমারে

কতবার ডাকিছে—মামা, আমার কাছে গঙ্গার তীরে আসে থাকেন, —আমি বুলিছি,—না বাবা—এই আমার স্বগ্‌গো—এ আমি নিজের হাতে তৈরী করিছি—তোমরা সব এ যুগির ছাওয়াল, তোমরা—এ বুঝবা না!

সুখেন্দু হো হো করে হেসেই কথাটা হালকা করে দিতে চায়—তারপর হাসি থামলে বলে, সন্তোষ কে দাদা ?

সন্তোষেরে চিনলে না ?—আমার ভাগনে সন্তোষ,—আমার এখানে থাকে পড়ত !

হাঁ, হাঁ চিনেছি—আমাদের সোনা কাকা ?

হাঁ,—সোনা—সে কতবার আমারে ডাকিছে—

সুখেন্দু আরও কয়েক বাড়ি দেখা করতে যাবে—বলে, এবার উঠি দাদা, আবার আসবো।

বসো, বসো—গল্প করি এট্টু তোমার সঙ্গে।

সুখেন্দু বলে, না দাদা—দক্ষিণপাড়ায় কবরেজ বাড়ি যেতে হবে একবার,—সন্ধ্যায় আসব আবার, তখন গল্প করব।

বাবুরাম ক্ষুণ্নস্বরে বলে—তা হলে আসো—কাজ আছে যখন, তখন আর আটকাতি চাইনে,—সন্ধ্যেকালে নাতিবউকে সঙ্গে নিয়ে আসো। কেমন বউ হইছে তোমার দেখতি যখন আর পাইনে—তখন একটু মিঠে বুলিই শোনবো।

হাঁ, দাদা—সন্ধ্যাকালে তাকে সঙ্গে নিয়ে আসব।

সুখেন্দু চলে গেল। বৃদ্ধ বাবুরামের মুখে অনেকদিন পরে একটু আশা আর আনন্দের রেখা ফুটে উঠল। জাবরকাটার ভঙ্গীতে ঠোঁট দুটি তার ঘন ঘন নড়ে উঠতে লাগল।

সন্ধ্যাকালে সুখেন্দু তার প্রতিশ্রুতি রাখল, আসবার সময় জয়ন্তীকে সে সঙ্গে নিয়ে এল। বাবুরামের সঙ্গে কথা বলতে হলে গ্রামের সববয়সী মেয়ে-পুরুষের যে ভয়ের কারণ ঘটে, এদের মোটেই তা ছিল না—এমন কি এমন কারণ যে কিছু আছে, তা তাদের জানাই ছিল না—তাই গল্পের স্রোত বয়ে গেল সহজ আনন্দে। জয়ন্তী ত বুড়োর রসিকতা আর বাঙাল কথা শুনে হেসেই লুটোপুটি। সুখেন্দুকে মাঝে মাঝে তাকে দমন করতে—বলতে

হচ্ছিল—একটু আস্তে।

শ্রীমতী আগাগোড়াই—এবং শেষের দিকে মতি বাড়ি এসেও—এদের সব কিছু শুনেছে, কিন্তু আশ্চর্য একটু উচ্চবাচ্যও তারা এ নিয়ে করলে না। আসল কথা সাহস পেলে না। জীবজগতে অতি হিংস্র জীবও বোঝে কোথায় তাদের প্রবল হিংসাবৃত্তিকে সংযত করে চলতে হয়।

সুতরাং শুধু সেই সন্ধ্যায় নয়,—এর পর থেকে একরকম প্রতি সন্ধ্যায় বাবুরামের সস্নেহ সাদর আমন্ত্রণে সুখেন্দু জয়ন্তীকে নিয়ে বাবুরামের ওখানে গিয়ে হাজির হত। বাবুরাম মনের আনন্দে কত কি বলে যেত—নিজের বাল্যস্মৃতি, নিজের অভিজ্ঞতা, নিজের কীর্তি—সব কিছু,—বাদ দিত শুধু একটি দিকের কথা: এদের দুর্ব্যবহার—এদের নির্যাতন। আনন্দের উচ্ছ্বাসে নিজের আত্মরক্ষার দিকটা বিস্মৃত হয় নি বাবুরাম।

আর এদিকে সুখেন্দু আর জয়ন্তী অবাক হয়ে বাবুরামের কথা শোনে—এ যেন আর এক জগতের কথা, রূপকথা।

বাবুরাম বলে, কত কম দামে মাছ কিনিছ তোমরা,—এই বরো ইলিশ মাছ?

সুখেন্দু বলে, দু'টাকা, আড়াই টাকা!

আমরা বিনে পয়সায় ইলিশ মাছ কিনিছি।

জয়ন্তী অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলে—ধ্যেৎ।

বাবুরাম বলে, ধ্যেৎ নয় লো, সত্যি,—শোন তা'হলি ব্যাপারটা খুলেই বলি।……আমাগারে দেশে এখন যেমন হইছে পাটের চাষ, তখন ছিল তেমনি নীলের। নীল কাটবার সময় উপরের খে' কাটে নিয়ে যাতো—মুথার সঙ্গে থাকত প্রায় হাতখানেক করে ডাটা। আমরা তখন খুব ছোট, এত ছোট যে কাপড় পরবারও বালাই ছিল না, ঐসব ডাটা উপড়োয়ে নিয়ে বোঝা বাঁধে নেংটো হয়েই নদীর ধারে দাঁড়ায়ে থাকতাম। জেলেরা ইলিশ মাছ ধরে নদীর কুল দিয়ে যাতো, আর জ্বালানীর জন্যি ঐ নীলের মুথার আঁটি নিয়ে মাছ দিয়ে যাতো—

জয়ন্তী আশ্চর্য হয়ে বলে,—বা রে! নীল কুঠী দেখেছেন তা'হলে আপনারা?

সুখেন্দু বলে, হাঁ, আমাদের গ্রামে নীলকুঠী ছিল, নদীর ধারে কুঠী ছিল,—এখন ভেঙে গেছে, জায়গাটাকে এখন ভাঙা-কুঠীঘাট বলে।

বাবুরাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, ছিল কি,—এখনও তার চিহ্ন দেখতি পাবা আমার এ বাড়িতে, কাল দিনিরবেলা আসো—দেখে যায়ো। ঐ যে উত্তরে পোতার ঘর—ওর দরজা হচ্ছে—নীলকুঠীর দরজা, এমন মোটা আর মজবুত দরজা তোমরা এখন দালানকোঠায়ও দেখতি পাবা না—আর ঐ ঘরেই আছে এক কাঠের সিন্দুক, তোমরা দুইজনেই বিছানা করে শুয়ে থাকতি পারবা তার উপর···আমি আগে শুতাম।

জয়ন্তী রহস্য করে বলে, আর দিদি?

চোখের পাতা দুটি পিট পিট করে ওঠে বাবুরামের, কণ্ঠস্বর ঈষৎ নিম্ন করে সে বলে, তোমাগারে দিদিও থাকত। থাকবি নে ক্যান, চিরকালই কি এমন ছিলাম।

জয়ন্তী একটু আগ্রহ দেখিয়েই বলে, দিদি আসবেন কবে, দাদু?

কে জানে, ভাই-—তোমাগারে দিদির মর্জি।

নিস্তারিণীর অনুপস্থিতিটা প্রথম দিকে স্বাভাবিক করে রাখবারই চেষ্টা করেছে বাবুরাম এদের কাছে, মনের ওদিকটা আর খোলে নি—। কিন্তু হপ্তা দুয়েক পরে আর শেষে সম্ভব হল না। মেয়েদের বুঝি একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। বৃদ্ধ অন্ধ স্বামীকে রেখে কোন স্ত্রীই দীর্ঘদিন দূরে থাকতে চায় না, তা ছাড়া মতি ও শ্রীমতীর মনে বাবুরামের প্রতি সক্রিয় না হলেও একটা নিষ্ক্রিয় বিরাগের ভাব লক্ষ্য করেছে জয়ন্তী। তাই একদিন পিসীমাকে সে জিজ্ঞাসা করেই বসলো। গ্রামের একটা নিদারুণ কলঙ্কের কথা, তবু জিজ্ঞাসা করছে—বধু, তাই মাতঙ্গিনী ব্যাপারটা আর তার কাছে চাপা রাখলেন না।

কথাটা শুনবার পর থেকেই বড্ড বেশি মায়া পড়ল জয়ন্তীর এই অসহায় অন্ধ বৃদ্ধটির উপর। বেচারা মনের এত দুঃখ চেপে তবুও কেমন হেসে রঙ্গ তামাসা করে তাদের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তী এও বুঝল—পুত্র আর পুত্রবধূর ভয়েই মনের এদিকটা খুলতে পারে না তাদের কাছে।

বাবুরামের সন্ধ্যার বৈঠকে নিজেদের কুকীর্তির প্রসঙ্গ একেবারেই ওঠে

না—কয়েকদিন লক্ষ্য করবার পর শ্রীমতী আর মতি—এদিকে আর তেমন দৃষ্টি দেয় না, জয়ন্তী এখন যেন সেটা আবিষ্কার করলে। ব্যাপারটা অবশ্য সুখেন্দুরও অজানা রইল না। এর পর থেকে ওরা দুজনেই এ নিয়ে আলোচনা করে—অথচ বুড়োর কাছে এ প্রসঙ্গ তোলা উচিত হবে কি না বুঝতে পারে না। এদিকে কলকাতা ফিরে যাবার দিনও তাদের ঘনিয়ে এসেছে: পিসীমা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন,—সুখেন্দুর ছুটিও প্রায় ফুরিয়ে এল।

ওরা চলে গেলে বুড়োর দিন কি করে কাটবে—কল্পনা করে ওরা শিউরে ওঠে। বুড়োর জন্যে বেশ একটু বেদনা বোধ করে ওরা দুজনেই।

যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় যথারীতি ওরা অন্ধ বাবুরামের সঙ্গে দেখা করতে এল—এবং অনেক দিনের মত—হয়ত বা শেষ বিদায় নিতে এল। স্বামী স্ত্রী দুজনের হৃদয়ই ভারাক্রান্ত। শ্রীমতী এ সময় রান্নাঘরেই থাকে,—মতি হাটখোলায়। জয়ন্তী যেন আগে থেকে বুঝতে পেরেছিল ওদের যাবার কথা শুনে কতটা আহত হয়ে আছে বুড়ো,—তাই বলবার সময় তার গলাটা একটু কেঁপে উঠল:

দাদু, কাল আমরা চলে যাচ্ছি।

দু'জনেই ?

হাঁ।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বাবুরামের বুক থেকে,—অন্ধ চোখের পাতা দুটি ধীরে ধীরে ভিজে উঠল,—ঠোঁট দুটি জাবরকাটার মত করে ঘন ঘন নড়তে লাগল। কিছুক্ষণ কেউই আর কোন কথা বলতে পারলে না। প্রায় মিনিট খানেক পরে বাবুরাম নিজেকে একটু সামলে নিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে,—দেখ ত তোমরা দুজনেই,—কেউ এখানে আছে ?

সুখেন্দু ও জয়ন্তী দুজনেই খুঁজে দেখে বললে, না, কেউ নেই।

নেই ত ?

না।

তা হলে তোমাগারে একটা কথা বলি।

বলুন।

গ্যাখো,—আমি বড় অসুখী, তোমাগারে সঙ্গে রঙ্গ তামাসাই করিছি। সে কথাডা আর বুলতি পারিনি।

সুখেন্দু উত্তর দিলে, আমরা তা জানি।

জানিছ,—কি করে জানলে ?—যা'ক, আমি আর এত নির্যাতন সহ্য করতে পারিনে।

সে ত বুঝতেই পারছি,—কি ব্যবস্থা করলে আপনার—একটু স্বস্তি—

জয়ন্তী এই সময় হঠাৎ বাবুরামকে বলে উঠল, আপনি আমাদের কাছে গিয়ে থাকবেন, দাদু!

ওরে আমার সোনার দিদিরে,—বেঁচে থাকো, স্বামীর আদরিণী হয়ে শত বছর বাঁচে থাকো। কথাডা শুনেই প্রাণডা জুড়োয়ে গেল।....না, ভাই, তোমাগারে এত কষ্ট দিতি চাইনে। তবে ইচ্ছে করলি তোমরাই আমায় এট্‌টু উপকার করতি পারো।

সুখেন্দু কৌতূহলী হয়ে বললে, বলুন।

বাবুরাম গলার স্বর আরও একটু নীচু করে বললে, তোমরা যদি আমারে নিয়ে যায়ে সন্তোষের বাসায় পৌঁছে দাও তা হলি বড় উপকার হয়।

সোনাকাকার বাসা ত আমি চিনিনে।

ঠিকানা আছে আমার কাছে।

তা হলে আর না পারার কি আছে ? কিন্তু এরা আপনাকে যেতে দেবে ত ?

তা কি দেয়!

তবে ?

তোমার এটটু কষ্ট করতি হবি, ভাই! তোমরা কখন নৌকোয় উঠবা—ঠিক করিছ ?

দুপুরে।

এইডে এটটু পিছোয়ে রাত্তিরি করতি হবি,—এরা ঘুমুলি আমারে এই ঘরের থে উঠোয়ে নিয়ে যাবা।

সুখেন্দু জয়ন্তীর দিকে তাকাল। জয়ন্তী মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালে।

সুখেন্দু বললে, আচ্ছা দাদা, তাই হবে, আপনি প্রস্তুত হয়ে থাকবেন।

আর দুই একটি কথার পর সুখেন্দু ও জয়ন্তী বাবুরামের কাছ থেকে সেদিনের মত বিদায় নিল,—বাবুরামের কিছু কাজে আসতে পারবে বলে মনটা তাদের একটু খুশিই লাগছিল।

পরের দিন সুখেন্দুদের নৌকা দুপুরেই ছাড়ল, অপেক্ষা করে রাত্রে ছাড়বার আর প্রয়োজন হয়নি: বাবুরাম আগের রাত্রে মারা গেছে। প্রভাতে হরিবোল শুনেছিল জয়ন্তী, কিন্তু সে যে বাবুরামের প্রয়াণে তা আর তখন বোঝেনি। সকালে শোনা গেল বাবুরাম হার্টফেল করে মারা গেছে,- বুড়ো হয়েছিল ত। কথাটা শুনে সুখেন্দু আর জয়ন্তী পরস্পরের মুখের দিকে শুধু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কথা বেরুল না কারো মুখ থেকে।

মুখ খুললে ওরা যখন দুপুরে নৌকা চাপলে। দুজনেই বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে চুপ করে বসে ছিল। নৌকা শ্মশান ঘাট ছাড়ালে বাবুরামের সদ্য-চিতাভস্মের দিকে চেয়ে সুখেন্দু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললে, একটা অনুতাপ নিয়ে চললাম। জয়ন্তীর চোখ দুটি ছলছল করে এল, বললে, জানি, ওরা কেউ বোধ হয় আমাদের পরামর্শ লুকিয়ে শুনেছিল।

তোমারও কি সন্দেহ হয়?

কি জানি, ঠিক বুঝি না।

কিন্তু এমন কাজই বা ওরা করতে যাবে কেন?

কলকাতা গিয়ে পাছে উনি সম্পত্তি ভাগনেকে লিখে দেন, স্বোপার্জিত সম্পত্তি ত!—পিসীমার কাছে শুনেছি ঐ ভয়েই ওরা দাদুকে দিদির ভাইয়ের বাড়ি যেতে দিতেন না।

অনাবশ্যক

ভোরে জানালা খুলেই আজ অনেক দিন পর আবার হঠাৎ নজর পড়ল ঘোষাল বাড়ির লাউ গাছটার দিকে। লাউ গাছটা শুকিয়ে মরে গেছে; পাতাগুলি দেখাচ্ছে আনাড়ির আর্জানো শুকনো ছোট দোক্তা পাতার মত, ডগাগুলি যেন শীর্ণ পচা দড়ি। মাচাটা ভেঙ্গে ধ্বসে গেছে। কিছু পচা বাঁশ হয় ত এ থেকে নিয়ে উনোন ধরানোর কাছে লাগানো হয়েছে।

সামান্য একটা লাউ গাছ! মরে গেছে,—যা'ক না!······কিন্তু না, কি যেন এক অস্বস্তিকর বেদনাদায়ক অনুভূতি জাগছে মনে। একদিন শরৎ-প্রভাতে নবোদিত সূর্যের মত এর গৌরবময় উদ্‌গম দেখে গৃহস্থের উল্লাস দেখেছি আমি। তারপর চারা গাছের সে কি যত্ন! হারু ঘোষাল নারায়ণ পুজা করে রোজ এর গায়ে শান্তিজল ছিটাতেন, গিন্নী দিতেন জল। ঘোষালের ছোট ছেলে স্কুলের ছুটির পর রোজ এর গোড়া খুঁচিয়ে দিত, সপ্তাহে দু'বার করে দিত সার,—পুত্রবধূ দিতেন ভাতের ফেন। চারাটি লক লক করে বেড়ে উঠল। ঘোষাল ঘরামি ডেকে করলেন মাচা। লাউ গাছ সহস্র শাখায় যেন নিজেকে বিস্তার করে দিল তার উপর, দিল সবুজ কোমল পুষ্ট কত ফল।

শীত চলে গেল। গাছের লাউ হ'ল শীর্ণ আর পাকাটে। গৃহস্থের যত্ন হ'ল শিথিলতর। খবর রাখি নি—কবে তার গোড়ায় জল দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে, সে মরে গেছে।

ছোটদি'র কথা মনে পড়ছে। ছোটদি আমার আপন কেউ নয়, আমাদের দেশের বাড়ির প্রতিবেশী আশুদার ছোট বোন, তবু তিনি আপনার চেয়ে বড় ছিলেন। আমাদের পাশের বাড়িতেই ছোটদিকে পেয়ে—আমার যে বোন নেই—এ কথা আর বুঝতে পারি নি কোনদিন।

আশুদা বোনদের বিয়ে দিয়ে টাকা নিতেন, বোনগুলি ছিল সুন্দরী আর বিয়েতে টাকা নেওয়াই ছিল ও বংশের রীতি। ছোটদি ছিলেন সবার

চেয়ে সুন্দরী, সুতরাং তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করতেন আশুদা —ফলে ছেলেবেলা তাঁকে একটুও অযত্ন পেতে দেখি নি বাড়িতে।

বাল্য-স্মৃতির কুহেলির মাঝে ছোটদির কৈশোরের মুখখানা মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। ছোটদি তখন দশ এগারো বছরের মেয়ে, আমার বয়স পাঁচ। গাঙে অর্থাৎ নদীতে পিসীমার সঙ্গে নাইতে গিয়েছিলাম। ডুব দিতে কিছুতেই সাহস পাচ্ছিলাম না, পিসীমা মুস্কিলে পড়েছিলেন, ছোটদি জলে কলসী ভাসিয়ে রেখে ছুটে এলেন। তারপর আমাকে কোলে জাপটে ধরে বুক-জলে গিয়ে এক সঙ্গে এক ডুব। ভয়ে এবং আনন্দে শিউরে উঠেছিলাম। ছোটদির সঙ্গে সজ্ঞানে সেই বোধ হয় আমার প্রথম ভাব। তার পরের কথা বেশ মনে আছে। ছোটদি আমকালে কাসুন্দি দিয়ে আম মেখে ডাকতেন, আয় মণি খাবি আয়। শীতকালে কুল।

শীতকালে চারা কুলগাছের চারদিকে ভিটে বেঁধে হিটেকুমোরের পুজা করেছি আমরা এক সঙ্গে। দত্ত বাড়ির সুরেশ আসত, মিত্তির বাড়ির কানু। ছোটদির নিজের ছোট কোন ভাই ছিল না, পুজার শেষে ঠাকুরের প্রণাম করে অন্যান্য প্রিয়জনের মঙ্গল কামনা করার সঙ্গে আমাদেরও মঙ্গল কামনা করে তিনি বলতেন—

তুমি ঠাকুর কালো,
আমার এই মণি ভাইগারে করো ভালো।

আরও কিছু বড় হবার পর ছোটদির সঙ্গ ছেড়ে যখন সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলায় মেতে উঠেছি—এমন এক দিনে ছোটদির বিয়ে হয়ে গেল।

ছোটদির বিয়েতে আমরা তেমন খুশি হই নি, কারণ, এ বিয়েতে আশুদা বেশ কিছু টাকা পেলেন বটে,—কিন্তু বরটা বড় বুড়ো, তা ছাড়া পরস্পর শোনা গেল, লোকটা মাতাল। ছোটদির এমন বর হবে এ যেন স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি আমরা।

ছোটদির শ্বশুর বাড়ি যাবার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমরা, সুরেশ ও আমি। ছোটদি আমাদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে কাঁদতে লাগলেন। দৃশ্যটা এখনও চোখের উপর ভাসছে আমার। ছোটদির

চোখের দিকে চেয়ে আমারও চোখে জল এসে গিয়েছিল।

বিয়ের পর বছরে একবার—কি বড় জোর দুইবার ছোটদি বাপের বাড়ি আসতেন। যখনই আসতেন—আমাদের জন্ত আনতেন খীরখুণ্ডি, তিলের নাড়ু আর নারকেলি সন্দেশ।

বছর চারেক পরে ছোটদি বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে এলেন। দেখে দুঃখ আর ভয়ে কেমন জবুথবু হয়ে গিয়েছিলাম আমি। তাঁকে দেখলেই পালিয়ে যেতাম, কথা বলতে পারতাম না। আমার সবচেয়ে বেশি ভয় হত আশুদার বউয়ের কথা ভেবে। আশ্চর্য হতাম কোন তিক্ত কথা কানে আসত না দেখে। ছোটদি কিন্তু আসার কয়েক দিন পর থেকেই বউদি অর্থাৎ আশুদার স্ত্রীকে রান্না থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন—তা ছাড়া তাঁর ছেলেমেয়েগুলিকে কোলে কাঁখে করে নিয়ে বেড়াতেন। দেখে ভাবতাম—হয় ত এই জন্তই কিছু বলছেন না বউদি।

কিন্তু শুধু কিছু বলা না বলার কথা নয়—এর কিছুদিন পরে দেখতে লাগলাম—অমন স্বার্থপর কুটিল বউদি অতি স্নিগ্ধ মধুর স্বরে কথা বলছেন ছোটদির সঙ্গে, আশুদা ও বউদি ছোটদির অসাক্ষাতে একান্তে বসে প্রায়ই ফিসফাস করে কি সব বলাবলি করেন। কিছুদিন পরে ছোটদিকে নিয়ে এক নৌকা করে আশুদা কোথায় চলে গেলেন। দিন চারেক পরে ফিরে এলেন।

এর পর দেখলাম আশুদার বাড়িতে এক ছোটদি ছাড়া সকলের মুখই খুব হাসিখুশি। খাওয়া দাওয়ারও চটক বাড়ল। কয়েক দিন পর শুনলাম আশুদা কয়েক বিঘে মাঠান জমি কিনছেন। ছোট হলেও বুঝতে বাকী রইল না—এ টাকার সঙ্গে ছোটদির শ্বশুর বাড়ির কিছু সম্বন্ধ আছে।

কয়েক মাসের মধ্যেই আশুদার বড় দুই মেয়ের পর পর বিয়ে হয়ে গেল, আশুদা আমিনের কাজ নিয়ে বিদেশে চলে গেলেন। ছোটদির শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তি বিক্রী করা টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল বুঝি, কারণ এর পর থেকেই দেখতাম, বৌদি আবার নিজের মূর্তি ধারণ করেছেন।

একদিন সকাল সকাল নাইতে গিয়ে দেখি ছোটদি নদীর কূলে কলসী

নামিয়ে রেখে কাঁদছেন। আমাকে দেখেই তরাসে হয়ে চোখের জল মুছে নিলেন।

বড় হয়েছি আগের মত ছোটদিকে আর জড়িয়ে ধরতে পারি নে, অথচ নিজেকে সামলেও রাখতে পারি নে। নিজের অজ্ঞাতেই কোন ফাঁকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ছোটদি, তুমি কাঁদছ ?

ছোটদি সে কথার উত্তর না দিয়ে কলসীর মুখের উপর শুধু নিজের মুখটা লুকাবার চেষ্টা করলেন। বুঝলাম তাঁর মনের কথা শুনবার যোগ্যপাত্র আমি নই, মানে যোগ্য বয়স তখনও আমার হয় নি।

মনের দুঃখ মনে চেপে নিজের বয়সকে ধিক্কার দিতে দিতে স্নান সেরে আমি বাড়ি ফিরলাম।

আশুদার বাড়ি আমাদের একেবারে লাগোয়া। তখন থেকে মাঝে মাঝে কান পেতে থাকতাম তাঁর বাড়ির দিকে। প্রায়ই আশুদার স্ত্রীর তিক্ত রুক্ষ কণ্ঠস্বর কানে আসত : রাক্ষুসী ! রাক্ষুসী সোয়ামীর ঘর খায়ে এখন এ ঘর খাতি আইছে—।

ছোটদি কি বলেন শুনবার জন্যও কান পেতে বসে থাকতাম,—কোন জবাবই কানে আসত না।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে গ্রাম ছেড়ে সহরে পড়তে গেলাম। নতুন বন্ধুর মাঝে নতুন পরিবেশে জীবন নতুন করে গড়ে উঠতে লাগল। দুঃখিনী ছোটদির কথা মনেও পড়ত না—আমার জীবনে ছোটদির স্নেহ তখন অনাবশ্যক। আশুদার গৃহেও ছোটদি তখন অনাবশ্যক, তাঁকে প্রৌঢ় বরের কাছে বিক্রী করে টাকা পাওয়া তখন আশুদার হয়ে গেছে, ছোটদির শ্বশুর বাড়ীর সম্পত্তি বিক্রী করে টাকা পাওয়াও তাঁদের হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে ছোটদির প্রয়োজন তাঁদের আর নেই। রান্নার জন্যও তাঁর প্রয়োজন বাড়িতে নেই, কারণ আশুদার পুত্রবধু এসেছে গৃহে।

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি ফিরে দেখি ছোটদিকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে—ও বাড়ির অন্নজল তাঁর উঠে গেছে। ছোটদির তখন

সোনার রঙ একেবারে কালি হয়ে গিয়েছে,—দেহ হয়েছে শীর্ণ। ছুপুর রৌদ্রে ছোটদি মস্ত এক ঝুড়ি কাঁধে করে আম কাঁঠালের পাতা কুড়িয়ে বেড়ান, রাত্রে তাই দিয়ে করেন ধানসিদ্ধ। সেই ধান ভেনে বিক্রী করে কিছু চাল থাকে, তাই দিয়ে তাঁর দিন চলে। ছোটদি মুড়ি ভেজেও বিক্রী করেন।

একদিন ভোরে উঠে একজামিনের পড়া পড়ছি—এমন সময় ছোটদি এক ধামি মুড়ি এনে আমার সামনে রেখে বললেন, ভাইডি, তোমার জন্যি তুড়ো গরম মুড়ি আনিছি, খায়ে দেখো।

ছোটদি 'তুই' ছেড়ে তুমি ধরেছেন দেখে একটু কষ্ট পেলাম মনে। নিজের দুর্দশার কথা মনে করেই হয় ত ঘনিষ্ঠতা দেখাবার সাহস হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। মৃদু হেসে বললাম, ছোটদি, আর তুমি আগেকার মত আমায় ভালবাস না, আমি তোমার পর হয়ে গেছি এখন ?

ছোটদি হকচকিয়ে উঠে কেমন করে আমার মুখের দিকে চাইলেন। বললাম,—'তুই' ছেড়ে 'তুমি' স্বরু করলে কি না—

বিষণ্ণ হাসি হেসে ছোটদি বললেন, তুমি এখন বড় হইছ, কলেজে পড়ো, যদি রাগ করো—তাই—

'তুই'—না বললে আমি খাবই না তোমার মুড়ি।

এবার ছোটদির মুখে আগেকার সেই সহজ হাসি ফিরে এল, বললেন, নে, পাগলামি না করে এবার তাড়াতাড়ি খায়ে নে, দেরী করলি জুড়োয়ে যাবেনে........ভাল কিছু ত আর খাওয়াতি পারি নে।

বলতে গিয়ে চোখে জল এসে গেল তাঁর—তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলেন তিনি।

গরম মুড়ি মুখে দিতে দিতে মনে পড়তে লাগল—শ্বশুর বাড়ি থেকে ছোটদির আনা খীরখুণ্ডি, ক্ষীর নাড়ু আর তিলের নাড়ুর কথা। মনে পড়তে লাগল—আরও ছেলে বেলায় তাঁর কাসুন্দি দিয়ে আম আর নুন-লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে মাখা টোপা কুলের কথা।

লেখাপড়া শেষ করে সহরে চাকরি করতে এসে দেশে যাওয়া আর বড় ঘটে উঠত না। গ্রামের আর আর সবার মত ছোটদির স্মৃতিও মন থেকে

এক রকম মুছেই গিয়েছিল। অনেক দিন পর একবার দেশে গিয়ে বাড়ি ঢুকবার আগে পথে দূর থেকে এক শীর্ণকায়া প্রৌঢ়াকে দেখে চিনি চিনি করেও যেন চিনতে পারছিলাম না। কাছে এলে বুঝে প্রণাম করে বললাম, ছোটদি কেমন আছ ?

নিজের কণ্ঠে উচ্চারিত কথা নিজের কানেই যেন ব্যঙ্গের মত শোনাল, তাই পরক্ষণেই নিজেকে শুধরে নিতে বললাম, এ তোমার কেমন চেহারা হয়ে গেছে ছোটদি ?

ছোটদি ম্লান হাসি হাসলেন : চেহারা ! চেহারা দিয়ে আর আমার কি হবি ? ভগবান এখন নিলেই বাঁচি, ভাই, এমন করে আর শরীল ধারণ করে লাভ কি ?

কেন—কি হয়েছে,—কি অসুখ তোমার ছোটদি ?

ছোটদি আমার সঙ্গে ধীরে ধীরে এগুতে এগুতে বললেন, বুকের মাঝে কেমন যেন করে, মাথাডা ঘুরোয়, রাত্রিতে ঘোম হয় না।

একটু থেমে ছোটদি বললেন, তোমারেই মনে মনে খুঁজতিছিলাম, ভাই, ভগবান তাই তোমারে পাঠায়ে দেলেন।

কেন,— ছোটদি ?

তুমি কোলকাতায় থাক, আমার জন্যি একটা ভাল তেল যদি পাঠায়ে দাও—ত...মাথায় বড় যন্ত্রণা,— ভাই—

নিশ্চয় দেব, ছোটদি, নিশ্চয় দেব, এবার গিয়েই পাঠিয়ে দেব। তোমার যখন যা দরকার হয় লিখো, পাঠিয়ে দেব আমি।

শুনে ছোটদির দুই চোখ জলে ভরে এল।

বছর দুয়েক পরে ছোটদি আমার কাছে এক চিঠি লিখে আধ সেরটাক চ্যবনপ্রাশ চেয়ে নিয়েছিলেন। তারপর দেশেও যাইনি, তাঁর খবরও কিছু রাখতাম না। বছর খানেক আগে হঠাৎ একখানা খামে চিঠি পেলাম। উপরে পুরুলিয়ার ছাপ। খুলে দেখি সুরেশের চিঠি। সুরেশ আমার কাছে চিঠি ত বড় লেখে না, তবে হঠাৎ— ? কৌতুহলী হয়ে তার চিঠিখানা পড়তে সুরু করলাম।

সুরেশ লিখেছে—

ভাই সন্তোষ, পাকিস্থান থেকে এলাম। একটা বড় দুঃখের খবর আছে, ভাই। ছোটদিকে মনে পড়ে তোমার ? সেই আমাদের ছেলেবেলার ছোটদি ! সেই নুন-লঙ্কা মেখে কুল খাওয়ানো, সেই কাসুন্দি দিয়ে আম-জাম খাওয়ানো, গাঙের জলে কলসী ভাসিয়ে সাঁতার শেখানো, [illegible] পুজো করানো ছোটদি। সেই শ্বশুর বাড়ি থেকে আমাদের জন্যে আঁচলে বেঁধে আনা তিল আর ক্ষীরের নাড়ু, বীরখুণ্ডি, নারকেলি সন্দেশ খাওয়ানোর কথা মনে আছে তোমার নিশ্চয়। সেই ছোটদি আর নেই, ভাই।

ছোটদি বিধবা মানুষ, বয়সও হয়েছিল, শুধু মারা গেছেন শুনলে হয়ত তেমন দুঃখের কারণ ঘটত না, কিন্তু যেভাবে তিনি মারা গেছেন, শুনলে গা-টা তোমার শিউরে উঠবে।

বছর চারেক আগে ছোটদির থাইসিস হয়েছিল। তাঁর নিজের ছোট্ট ঘরটিতে একাই তিনি পড়ে থাকতেন। এর আগে অতিরিক্ত খেটে খেটে বিশ পঞ্চাশ তিনি যা জমিয়েছিলেন, দু' দিনেই তা ফুরিয়ে গেল, এর পর অনেক তিক্ত কথা শুনিয়ে আশুদার স্ত্রীই তাঁকে দুটি অনাদরের অন্ন দিতেন। কিন্তু ভগবান তা-ও তাঁর বন্ধ করে দিলেন। দেশে বিপর্যয় ঘটলে সবাই প্রায় নিজের নিজের পরিবার নিয়ে পালাতে লাগলেন। আশুদা কলকাতায়ই ছিলেন, তিনিও গিয়ে তাঁর পরিবারের সকলকে নিয়ে এলেন। ছোটদি অনেক কান্নাকাটি করেছিলেন, কিন্তু এই মৃত্যুপথযাত্রী যক্ষ্মারোগীকে কে সঙ্গে আনবে ? তাঁকেও দোষ দেওয়া যায় না। ছোটদিকে এনে রাখবেনই বা তিনি কোথায় ? তা ছাড়া অত ভিড়ে তাঁকে সঙ্গে আনাও সম্ভব ছিল না। সুতরাং ছোটদি নিতান্ত অসহায় অবস্থাতেই ঘরে পড়ে রইলেন।

কল্পনা করে দেখ, আশেপাশের কোন বাড়িতে লোকজন নেই, অনেক দূরে নমে কামার আর পিয়ো ধোপার বাড়িতে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে, আর শিয়াল ডাকে, তার মাঝে নিরালা একঘরে একা একা ঐ মৃত্যুপথযাত্রী রোগী। বুঝলাম, ভিন্ন জাতের দু'একজন যারা গ্রামে ছিল, তারাই মাঝে মাঝে দুটি ভাত দিয়ে তাঁর প্রাণটা কিছুদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল।

আমি যখন দেশে গেছি, তার দিন পনের আগে ছোটদির ঘরের দরজায় কয়েকটা শেয়াল আনাগোনা করতে দেখে খামারপাড়ার করিম শেখ লাঠি হাতে এগিয়ে যায়, গিয়ে দেখে ছোটদির মৃতদেহ ওরা খেয়ে অর্ধেক সাবাড় ক'দিন আগে তিনি া গেলেন, কেউ সঠিক করে বলতে পারে না। ননের মা ওর দিন চারেক আগে তাঁকে দুটি ভাত দিয়েছিল, এইকথা শুধু জানা যায়।

ছোটদির দেহটা সৎকার করাও তেমন সহজ হয়নি। কঠিন রোগগ্রস্ত, শেয়ালে খাওয়া মড়া কে ছোঁবে এ দেশে? সহরের রাস্তায় মরা গরু-মোষ-ভেড়ারও ব্যবস্থা আছে দেশে, তাদের চামড়া যে কাজে লাগে, কিন্তু এ যে মানুষ!

সুরেশের চিঠির সবটুকু আর পড়া হয়ে উঠল না, দুঃসহ যন্ত্রণায় মাথাটা ঘুরে উঠল, ঝাপসা দৃষ্টির আড়ালে বিশ্বসংসার যেন অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে গেল।